গল্পপঞ্চক
মনন দাস

গল্পপঞ্চক

মনন দাস

পরিবেশক
লিপিকা
৩০/১এ, কলেজ রো
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

ঃ উৎসর্গ ঃ

বন্ধুবর শ্রী শ্যামল বোস মহাশয়কে

লেখকের অন্যান্য ই-বই ঃ

কবিতা সংগ্রহ
www.archive.org/details/KobitaSangraha

White Flowers
www.archive.org/details/WhiteFlowers

গল্প ঃ
অন্যস্বাদ
www.archive.org/details/AnyaSwad

উপন্যাস ঃ
মনভূমি
www.archive.org/details/Manabhumi

ঝলমলি
www.archive.org/details/Jhalmali

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহজ পাঠ-এর সুরারোপ
www.archive.org/details/SahajPath

কিশোর উপন্যাস ঃ
রাজু নারানের কীর্তি
www.archive.org/details/RajuNaranerKirti

ছড়ায় লেখা মজার গল্প ঃ
আটটা ঠাট্টা
youtube search Manan Das / Four Fun
youtube search Manan Das / More Four Fun

সূচীপত্র

মেঘবতী কন্যা

সন্ধ্যা হয়ে এল। এবার গলির আলোগুলি জ্বলে উঠবে। মফঃস্বল শহরের এই মহামহোপাধ্যায় লেনের ল্যাম্প পোষ্ট গুলি বেশ দূরে দূরে। একটা আলোর পরে কিছুটা আলো-আঁধারি। এমনই এক আলো আর আঁধারির মাঝ বরাবর মহামহোপাধ্যায় বাড়ি। পুরোনো শ্যাওলা ধরা পলেস্তারা খসে যাওয়া একতলা বাড়িটার দেওয়ালে ছোট ছোট ইটের গাঁথুনি দেখলে বোঝা যায় এটি শতাব্দী প্রাচীন, সেকালে এমনই ছোট ইটের প্রচলন ছিল।

এ বাড়ির ঠাকুর ঘরে নারায়ণ বিগ্রহের আরতির ঘণ্টার টুং টুং মৃদু শব্দ এখন শোনা যাবে, চন্দন ধূপের সুবাস ছড়িয়ে পড়বে। আরতি করবে এ বাড়ির অরক্ষণীয়া কন্যা কমলা। অসাধারণ কারুকার্য মণ্ডিত এক হস্ত পরিমাণ দীর্ঘ কষ্ঠিপাথরের এই নারায়ণ মূর্তি কোনকাল থেকে যে এ বংশে পূজিত হয়ে আসছে কমলা তা জানেনা।

এ গলির নামকরণ তারই ঠাকুরদার বাবার নামে। সে কোন কাল আগের কথা, সে কালের সেই পণ্ডিত বংশের শেষ বংশধর কমলা বিএ পাশ করে অর্থাভাবে পড়াশোনায় ক্ষান্ত দিয়েছে, অবশ্য সংস্কৃতে অনার্স ছিল। কমলার বাবা ছিলেন হাই স্কুলের সংস্কৃতের শিক্ষক, তিনি বছর তিনেক আগে গত হয়েছেন, এখন মা আর মেয়ের সংসার। এই জীর্ণ বাড়িটার মতো কমলার মনটা দিনে দিনে হতাশায় জীর্ণ হতে হতে আঠাশ বছর বয়সে পৌঁছেছে।

ছোটবেলা থেকে মেঘ তার বড় প্রিয়। গুরুগুর মেঘের গর্জনে তার মন উল্লসিত হয়ে উঠত। প্রথম বৃষ্টির আগমনে সে উঠোনে নেমে দুহাত ছড়িয়ে ঘুরে ঘুরে বৃষ্টিতে ভিজত আর খিলখিল করে হাসত। নবযৌবনে তার সে উচ্ছাস যেমন বাঁধ ভাঙা নদীর মতো তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেত। ...এখন আর সে অনুভবের সামান্য মাত্রও অবশিষ্ট নেই।

জানলার ধারে পড়ার টেবিলে বসে গালে হাত দিয়ে কমলা এলোমেলো কত কিছু ভাবনায় মগ্ন। তার সামনে খোলা একটা পুরানো গ্রন্থ – মেঘদূত...

...অনেক দিন কাটল এ পৃথিবীতে, জ্ঞান হওয়া থেকে শিখেছি পরিবারের সকলকে গৃহদেবতা নারায়ণের পূজা করে তারপর দিন শুরু করতে হবে। এভাবে নিত্য পূজা আর একমনে সরস্বতীর আরাধনা – এভাবেই এল যৌবন, তারপর? চব্বিশ পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত জীবনে একটা কিছু উত্তরণের আশায় দিন কেটেছে। সামান্য আশা আকাঙ্খা – বিয়ে, ঘর-সংসার, এইটুকু! সাধারণ পরিবারের সাধারণ মেয়ে হিসেবে এইটুকু চাওয়া, কিন্তু হলনা। বাবার মৃত্যু সব আশার ছেদ, একটা অন্ধকার পর্দা নেমে এল জীবনে। নিজেকে রক্ষণশীলতার আবরণে মুড়ে চলাফেরা

ছিল এ বাড়ির শিক্ষা। এ বাড়ি মহামহোপাধ্যায় বাড়ি আর পাঁচটা বাড়ির মতো নয়। এভাবেই চলতে চলতে এই বিগ্রহের মতো, এই চিরকালীন চন্দনগন্ধী ধূপের মতো, এই স্থবির বাড়িটির মতো আমিও স্থবির হয়ে গেছি।

একদিন কলেজ থেকে ফেরার পথে ট্রেনে একটা লোক চম্পা ফুলের গন্ধ ধূপ বিক্রি করছিল, ভালো লাগায় এক প্যাকেট কিনে এনেছিলাম, সন্ধ্যায় পূজা করার সময় সেই ধূপ জ্বালাতে এক মোহময় গন্ধে বাড়ি ভরে গিয়েছিল। তখন ঠাকুর্দা বেঁচে, প্রায় অথর্ব, বিছানায় শুয়েই কাটে সারাক্ষণ, কষ্ট করে উঠে বারান্দায় দাঁড়িয়ে অসহায় গলায় চিৎকার করেছিলেন – এ কি অশুদ্ধ গন্ধ! কে জ্বালিয়েছে এ ধূপ? কে জ্বালিয়েছে? নিভিয়ে দাও, এখনই নিভিয়ে দাও–

তাড়াতড়ি সেদিন ওটা নিভিয়ে চন্দন ধূপ জ্বালিয়েছিলাম। এভাবেই জীবনযাপন।

বিবাহের চেষ্টা সেও তো অনেক হলো, কিন্তু .... মনে পড়ে প্রথম সেই দেখতে আসার কথা। সকাল থেকে মনে মনে সে কি দারুণ উত্তেজনা! যেন আজই বিয়ের পাকাদেখা। মনে পড়ে সেদিনও ছিল এমন বর্ষাকাল। সারাদিন আকাশে মেঘের গুরুগুরু! না কি দুরুদুরু শব্দ বুকের মধ্যে! বিকাল বেলা মা সাজিয়ে দিলেন, তারপর চিবুক ধরে মুখের পানে দেখতে দেখতে অস্ফুষ্টে বললেন – কি সুন্দর মেয়ে আমার! তারপর লজ্জায় জড়সড় হয়ে বসা। ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বাবা বললেন – বারবার দেখতে আসা আমার মতে অনুচিত, তাই ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে এলাম, দেখে নিক, জেনে নিক। কিন্তু ছেলে কিছুই জিজ্ঞাসা করল না। তারপর খবর এল ছেলে আরও ফর্সা রঙ চায়! হায়! আমিতো নিজেকে জানি সেই কালিদাসের মেঘদূতের নায়িকা ... গর্ব করেই জানি। যার দেখার মতো চোখ নেই সে-ই দেখতে পায়না...

তন্বী শ্যামা শিখরি দশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভী
শ্রোণীভারাদ অলসগমনা স্তোকোনম্রা স্তনাভ্যাং...

আঃ! ছিঃ! ছিঃ! আমার মরণও হয়না! কি লজ্জা কি লজ্জা! সেই প্রথম বুঝলাম মেয়ে হওয়ার কি লাঞ্ছনা! তারপর এমন কতবার! পছন্দ হলো তো দেনাপাওনা? হায়রে! একটু একটু করে যেমন প্রদীপ নিভে আসে সেভাবে –

তথাকথিত প্রেম করতেও পারলাম না। কেউ কেউ এগিয়ে এসে চেষ্টা করেনি তাতো নয়, কিন্তু সাড়া দিতে পারলাম কই। কাউকে দেখে মন উচাটন হয়ে ওঠা – তাই বা হল কই! ওসব বোধহয় কাব্যে গল্পে উপন্যাসে হয়, বাস্তবে নয়।

এখন সারাদিনের একঘেয়ে নিত্যকর্ম, রাত্রি আসে, শুতে যাওয়া, তারপর প্রায় নিদ্রাহীন রাত্রি কাটিয়ে পুনরায় — এইভাবেই অনুভূতিহীন কালযাপন, এ কতদিন? আমৃত্যু? সেটা কতদূর?

সারাদিন মায়ের সঙ্গে কটা কথাই বা হয়! তাও একেবারেই প্রয়োজনীয় কথা। এই যন্ত্রণার জীবন বা জীবন যন্ত্রণা ক্রমশঃ সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে। এবার আমি শান্তি চাই।

বাড়ির ঐতিহ্য অনুযায়ী এমন একটা বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করলাম যা নিয়ে দুএকটা ট্যুইশনিও করতে পারিনা। মেয়ে হয়ে জন্মেছি, উপবীতধারী নই, পূজার্চনাকেও জীবিকা করতে পারলাম না। শিক্ষকতার চাকরি সেও অনেক জটিল পথ আর টাকার খেলা। অতএব? জমা টাকা আর কিছু পেনসনে সংসার কোনক্রমে চলে যায়। মা চলে গেলে এদিকে পেনসনটুকুও বন্ধ হয়ে যাবে, ওদিকে আরও নিঃসঙ্গ জীবন। ভাবতে গেলে সব অন্ধকার হয়ে আসে।

কিন্তু আমি আগে চলে গেলে? মা?

নাঃ, অত ভাবতে পারিনা। আমি চলে যাব। মৃত্যুলোকে পাব প্রাণ! কাকে নিবেদন করব কালিদাসের গর্বের নায়িকাকে? কোথায় সে উপযুক্ত পাত্র? না সে এলোনা এ জীবনে। কিন্তু অরক্ষণীয়া মেয়ের মৃত্যু হলে নাকি আত্মা নরকগামী হয়, চতুর্দশ পুরুষ রসাতলে যায়! ঠাকুর্দাকে এসব বিধান দিতে শুনেছি। এখন তার বংশে কি হবে? কিন্তু এ কি আমার কুসংস্কার? আমি এক সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ!

এখন আষাঢ় মাস। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। অনেক দিন পর মেঘদূত বইটা বার করেছি, আমার প্রিয়তম গ্রন্থ! ভেবেছিলাম পড়তে পড়তে অনুভূতিহীন অসাড় জীবনে কিছু সুখশিহরণ খুঁজে পাব। কিন্তু না, বড় বিরক্ত লাগছে। অথচ উনিশ বছর বয়সের সেই আষাঢ় মাসে যখন মেঘদূত পড়তে শুরু করেছিলাম সে কি শিহরণ! সেই সময় আমি দিনে রাতে শয়নে স্বপনে মেঘদূতের কালে! এই যে স্তবকটি —

> হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং
> নীতা লোধ্রপ্রসবরজসা পাণ্ডুতামননে শ্রীঃ।
> চূড়াপাশে নবকুরুবক্ং চারু কর্ণে শিরীষং
> সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম।।

হস্তে লীলাকমল, অলকে কুন্দকোরক, মুখশ্রী লোধ্রপুষ্পরাগে পাণ্ডুবর্ণ, কেশপাশে নবকুরুবক, কর্ণে চারু শিরীষ পুষ্প এবং সীমন্তে বর্ষাজাত কদম্ব — মনে মনে সেই সব নারীদের মতো সাজপোষাক ও পুষ্পালঙ্কারে ভূষিতা হয়ে পুষ্পগন্ধে

আপ্লুত হতাম। বাড়ির এই বদ্ধ পরিবেশ ছাড়িয়ে আমি কল্পলোরেপ এক আনন্দময় জগতে বিচরণ করতাম।

আমাদের বাড়ির পেছনে একটা কদম গাছ আছে, বছরে একবারই ফুল ফোটে। ছাদ থেকে হাত বাড়িয়ে পাড়া যায়। কয়েকটি কদম ফুল পেড়ে এনে ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখতাম। খোঁপায় গুঁজতাম কদম ফুল! মৃদু গন্ধ ছড়িয়ে পড়ত সারা ঘরে, সেই গন্ধে বুঁদ হয়ে চোখ বুজে হারিয়ে যেতাম সেই যুগে, ঘুমিয়ে পড়তাম! আর এই যে, এই শ্লোকটি –

নীবীবন্ধোচ্ছ্বসিতশিথিলং যত্র বিম্বাধারাণাং
ক্ষৌমং রাগাদনিভৃতকরেধাক্ষিপৎসু প্রিয়েষু।
অর্চিস্তুঙ্গানভিমুখমপি প্রাপ্য রত্নপ্রদীপান
হ্রীমূঢ়ানাং ভবতি বিফলপ্রেণা চূর্ণমুষ্টিঃ।।

যেখানে প্রণয়িগণ অনুরাগবশে নীবীবন্ধ মুক্ত ক'রে শিথিল ক্ষৌমবাস চঞ্চল হস্তে হরণ করে এবং বিম্বাধারাগণ লজ্জায় বিমূঢ় হয়ে উজ্জ্বল রত্নদীপের অভিমুখে বৃথা চূর্ণমুষ্টি নিক্ষেপ করে – ঘুমের মাঝে নীবীবন্ধ খুলে দেয় কোন রূপবান যুবক! সারা শরীর জুড়ে সে কি আলোড়ন! ঘুম ভেঙে যেত। কি লজ্জা! মনে হতো সবাই দেখতে পাচ্ছে বুঝতে পারছে আমার আত্মরতিক্রিয়া!

আজ দেখি তার কণিকামাত্র নেই। পড়তে বিরক্ত লাগছে। তাহলে? বেঁচে থেকে আমি কি করব? মৃত্যুর পর আমি মেঘের জগতে চলে যাব, ভেসে ভেসে চলে যাব সেই সুন্দর আনন্দলোকে।

সন্ধ্যা হয়ে এল। আজ কি ফুটেছে কদম ফুল? সুগন্ধ আসছে যেন? কতদিন ছাদে ওঠা হয়নি। পচা পাতা ধুলোকাদা আর শ্যাওলায় নোংরা হয়ে আছে। পরিষ্কার করতে ইচ্ছা করেনা। কি হবে পরিষ্কার করে! বইগুলোতে দেখছি উই ধরছে, সব নষ্ট করে দেবে। যাকগে, কি হবে পরিষ্কার করে। কি হবে রক্ষা করে? কি কাজে লাগবে? সব মরে যাক। আমি মরে যাই। কিন্তু অরক্ষণীয়ার কি গতি হবে? একটা কাজ করতে পারি, কোনো যুবককে মন্ত্র পড়ে মনে মনে পতিত্বে বরণ করে নিয়ে দোষ কাটাতে পারি! ঠিক আছে, আজই পূজা ও সন্ধ্যারতি শেষে দাঁড়াব সদর দ্বারে, এসময় সন্ধ্যার লোকাল ট্রেনে কত লোক ঘরে ফেরে, প্রথম যাকে দেখব – কোনো যুবক

– কমলা, মা – সন্ধ্যা হয়ে গেল –

– হ্যাঁ মা, আসছি –

হঠাৎ কেমন যেন উত্তেজিত বোধ করছিল কমলা, পূজার যোগাড় করতে গিয়ে হাত কাঁপছিল। এভাবে সে প্রদীপ জ্বালাল, চন্দনগন্ধী ধূপ জ্বালাল, আরতি করল, তারপর দুরুদুরু বুকে বাইরের দরজায় এসে দাঁড়াল। বড় চঞ্চল আর উচ্ছসিত বুক, সেই বিশ-বাইশ বছর বয়সের মতো! যেন অনেক জ্বর গায়ে! কিছু একটা করতে হবে, অন্তত কোনো অছিলায় দাঁড় করিয়ে নামটা অন্তত জানতে হবে। কি বলব? এই যে শুনছেন – কিছু মনে করবেন না, আপনার নামটা বলবেন –

বাড়ির সামনে দিয়ে এ রাস্তাটা বাঁক নিয়ে তারপর সোজা চলে গেছে স্টেশনের দিকে, দেখা যাচ্ছে বেশ কিছু মানুষ আসছে, কিন্তু একি! এ কে এগিয়ে আসছে সামনে! কাঁধে ব্যাগ, মাঝে মাঝে ডাক দিচ্ছে – মুখরোচক গরম।

প্রায়ই ঘর থেকে এ ডাক শুনি। যদিও আমি কোনোদিন ডাকিনা বা কিনিনা – কিন্তু আজ ভাগ্যের এ কি পরিহাস! না কি উপহাস! সারা পৃথিবীর মানুষ হো হো করে উপহাসের হাসি হাসছে। হায়রে!

কমলার শরীর কি জীর্ণ! সারা শরীর উইপোকায় খাচ্ছে! উই পোকায় খাওয়া মেঘদূতের শরীর! সে তাকিয়ে আছে সামনে এগিয়ে আসা যুবকের দিকে, কিন্তু কিছুই দেখছে না।

– ঝুরিভাজা নেবেন? কত দেবো? পাঁচ টাকার? – একেবারে সামনে এসে দাঁড়াল সে।

– ও হ্যাঁ – দাঁড়ান টাকা নিয়ে আসি –

ঘরে এসে নিঃশব্দ কান্নায় ভেঙে পড়ল কমলা, কিন্তু পরক্ষণে সামলে নিল, একটু দাঁড়িয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল – তোমার প্রতিজ্ঞা – তুমি কি ভাবছিলে কমলা? ফুলের মালা হাতে মেঘদূত থেকে উঠে আসবে কোনো গন্ধর্বকুমার? তুমি চেয়েছিলে একটা মানুষ – এক যুবক, ব্যাস, নামটা জেনে নাও, আর কিছু তো তোমার প্রয়োজন নেই। তুমি তো শুধু দোষ কাটিয়ে মৃত্যুলোকে পাড়ি দেবে। তাহলে?

ড্রয়ার থেকে টাকা নিয়ে এগিয়ে গেল সে।

– লেবু দেবো? – একটা স্টিলের গ্লাসের মধ্যে চামচ দিয়ে ঝুরিভাজা মাখতে মাখতে বলল যুবক।

– দিন।

ঝুরি ভাজার ঠোঙা এগিয়ে ধরে হঠাৎ ওপর দিকে এদিকে ওদিকে তাকয়ে নাক টেনে গন্ধ নিল সে, বলল – কদম ফুলের গন্ধ না?

—হ্যাঁ।

—আপনাদের বাড়িতে গাছ আছে বুঝি?

—হ্যাঁ, কেন?

—না, এমনি। গন্ধটা বেশ, আর ফুলটাও ভারি অদ্ভূত!

—কিন্তু এখন তো অন্ধকার হয়ে গেছে, পাড়া যাবেনা — ঠোঙা হাতে নিতে নিতে বলল কমলা।

—না না আমি চাইছি না।

—ইচ্ছে যখন হয়েছে কাল এসে নিতে পারেন, পেড়ে রাখব — টাকা দিতে দিতে বলল কমলা — কি নাম আপনার? — বলেই ফেলল।

—সুকুমার, সুকুমার দাস।

চেয়ারে বসে লেবু মাখা ঝুরিভাজা তারিয়ে তারিয়ে খেতে বেশ ভাল লাগছিল কমলার। এই চেয়ারটি তার বড় আশ্রয়। এখানে বসে তার পড়াশোনা, ভাবনা আর নিজেকে হারানো ও খুঁজে পাওয়া সব!

শ্যামলা ছেলেটা দেখতে বেশ! ছেলেটা না লোকটা! অল্প অল্প দাড়ি গোঁফ ঢাকা মুখটা কেমন করুণ করুণ। গায়ে হলদে রঙের গেঞ্জিটা ভালোই লাগছে, হুট করে কদম ফুল চেয়ে বসল! না চায়নিতো! ওই হলো, আধবুড়ো ছেলে সোজাসুজি কি আর ফুল চাইতে পারে! এসব এলোমেলো ভাবনায় তার মনটা বেশ হালকা হয়ে গেল। অন্য দিন সে রুটি বেলে দেয়ে, মা সেঁকে। আজ মাকে বলল — আমি একাই করে নিচ্ছি, তোমার শরীরটা ভালো নেই বলছিলে।

মায়ের শরীরটা বেশিরভাগ দিনই ভালো থাকে না, কমলা নিজেকে দিয়েই বোঝে শরীর থেকেও অসুখটা বিমর্ষ মনের।

রাত্রে শোয়ার পর মনে নেমে এল যত ভাবনা... আমার প্রতিজ্ঞা... নাম তার সুকুমার... বিয়ের মন্ত্র... কবে কোথায় কখন উচ্চারণ করব?... ঠাকুরের কাছে... যদিদং হৃদয়ং তব...

আশ্চর্য শান্তভাবে ঘুমিয়ে পড়ল কমলা।

ঘুম ভাঙল একেবারে ভোরবেলা। বাড়ির পিছনে অযত্ন বাগানে আছে কিছু পাখি, তারা গান গায়, কান পেতে শুনল। অন্যদিন ঘুম আসতে আসতে মাঝ রাত, ভোরের দিকটা ঘুমটা গাঢ় হয়, আজ কিন্তু অন্যরকম লাগছে, উঠে পড়ল সে, আস্তে আস্তে ছাদে উঠল। আকাশে হালকা মেঘ, ফুরফুরে বাতাস বইছে, বড় বড় নিঃশ্বাস

নিল, হঠাৎ মনে পড়ল বালিকা বেলার কথা – তখন ভোরবেলা ঘুম ভেঙেই ছাদে চলে আসত। এমন মেঘের দিনে তো কথাই নেই।

চোখ চলে গেল সোজা কদম গাছটার দিকে, গাছের প্রায় আধখানা ঝুঁকে পড়েছে ছাদের ওপর, ফুলে ফুলে গাছটা ভরে আছে, এগোতে গিয়ে দেখল পিছল, পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল, গাছের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে গন্ধ নিল, সেই বালিকা বেলার মতো।

ঝরা পাতা ধুলো বৃষ্টিতে পচে নোংরা হয়ে আছে, বিশেষতঃ গাছের দিকটা, সিঁড়ির কোণে পড়ে থাকা ঝাঁটাটা অনেক দিন পর হাতে তুলে নিল।

ছাদ থেকে ঘর দুয়ার সব পরিস্কার করে স্নান করে রোজের মতো অযত্নবাগানের অবহেলায় বেঁচে থাকা দুচারটে গাছের দুচারটি ফুল তুলে যখন ঠাকুর ঘরে ঢুকল কমলা তখন তার শরীর ও মন শুদ্ধ ও শুচি মনে হচ্ছিল। শান্ত মনে পূজায় বসল সে। বিগ্রহ স্নান করাতে করাতে নানা কথা ভাবছিল।

– আজ আমার বিয়ে ঠাকুর, আমার প্রতিজ্ঞা আমি রক্ষা করব। তারপর আমি তো চলেই যাব তোমার কাছে, আমাকে চরণে ঠাঁই দিও।

ভাবতে ভাবতে ঠোঁট কেঁপে উঠল, চোখ জলে ভরে গেল।

আর দেখ, ও কেমন ফুল চেয়ে বসল! ফুলের মালা দেবার সুযোগ করে দিল। আজ কি আমি উপবাস করব? আমি এক জীব! নানা সংস্কারে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা পড়ে আছি। মাঝে মাঝে ভাবি সব ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলে যা ইচ্ছে তাই করব কিন্তু এ জীবনে তা আর হল না।

ওঁ গঙ্গে চ যমুনেশ্চৈব গোদাবরী সরস্বতী ...

দুপুরে ভাত তরকারি রাঁধল, মাকে খেতে দিল, বলল আমি পরে খাব, খিদে নেই।

– সকালেও তো কিছু খেলিনা – মা বললেন।

– খাব মা, খিদে হলে খাব।

ফুলের একটা বড় সাজি পড়ে আছে, অনেকদিন ব্যবহার হয় না, ওটা নামিয়ে পরিষ্কার করে ছাদে গিয়ে অনেক ফুল তুলল। ফুল তুলতে এত ভালো লাগছিল! আনন্দে গুনগুন করে গান গেয়ে উঠল – আমার পরাণ যাহা চায় –

মা ঘুমিয়ে পড়েছে। ঠাকুর ঘরে নিশ্চিন্তে মালা গাঁথতে বসল সে। প্রায় কোল পর্যন্ত হবে এমন একটা মালা গেঁথে ঠাকুর প্রণাম করে গলায় পরল। কেমন এক উত্তেজনায় আচ্ছন্ন সে, জোড়হাত করে চোখ বুজে স্মরণ করল সুকুমারের মুখ, উচ্চারণ করল বিবাহের সেই প্রধান মন্ত্র – যদেতৎ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম, যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব। তিনবার।

নিজেকে কেমন হালকা লাগছিল, আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল আয়নার সামনে, দুহাত দুপাশে ছড়িয়ে নৃত্যছন্দে দোলায়িত করল দুহাত, নিঃশব্দে হাসল প্রাণ খুলে। অনেক দিনের পুরোনো আয়না, কেমন ঝাপসা ঝাপসা দেখায়, তার পূর্ণ শরীর যেন কোন মেঘলোকে! মন্ত্রমুগ্ধ তার মনে অনুরণিত হচ্ছিল – যদিদং হৃদয়ং মম ...

মালা খুলে সযত্নে রাখল বিগ্রহের পায়ের কাছে। এখন শুধুই অপেক্ষা!

দিন কেটে গেল। ক্ষুধা নেই, তৃষ্ণা নেই, আছে শুধু এক অনাবিল আনন্দ! কি হল রে তোর কমলা? – নিজেকেই জিজ্ঞাসা করল সে। – আমি মরেছি! – নিজেই উত্তর দিল।

সন্ধ্যা হল, পূজার্চনা আরতি হল। একটু তাড়াতাড়ি হল কি? যদি সে না ডেকেই চলে যায়? এলো খোঁপায় একটা কদম ফুল গুঁজল, একটা পলিথিনের ব্যাগে মালাটা নিল, সাথে কয়েকটা পাতা সমতে ফুল, বাইরের দরজা সামান্য ফাঁক করে দাঁড়াল অভিসারিকা! মা এখন জপ করতে বসেছেন।

শোনা গেল সন্ধ্যের লোকাল ট্রেনের হর্ণ, তারপর – ঐ দেখা যায় – আবছা অন্ধকারে একটু পিছিয়ে এল কমলা।

একটু উঁকিঝুঁকি দিল সুকুমার, তারপর – ঝুরিভাজা চাই, মুখরোচক ঝুরিভাজা একটু থেমে আবার ডাকল।

কি লজ্জা! কি লজ্জা! পা যেন আটকে গেছে মাটিতে! ওই আবার ডাক – এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলল কমলা – এই যে, আপনি এসে গেছেন? এই নিন – একটা পাতা সমেত ফুল হাতে নিয়ে বাড়িয়ে ধরল। সাগ্রহে ফুল নিল সুকুমার, মুগ্ধ দৃষ্টি রাখল কমলার মুখের ওপর তারপর লজ্জিত হয়ে দেখল ফুলের দিকে, গন্ধ নিল।

এবার ব্যাগটা এগিয়ে ধরল কমলা।

– একি! এত ফুল! এত ফুল নিয়ে – বিব্রত ভাবে ব্যাগটা হাতে নিল – এত ফুল নিয়ে কি করব?

– ঘরে ঠাকুরকে দেবেন।

– ঠাকুর? ঠাকুর তো নেই!

সহসা ঝোড়ো হাওয়া, মেঘের গর্জনে কেঁপে উঠল চারিদিক, সাথে মুষলধারে বৃষ্টি নামল।

– ভেতরে এসে দাঁড়ান, – পিছিয়ে এসে বলল কমলা, সুকুমার ভেতরে এল, দরজা ভেজিয়ে দিল কমলা। তার বুক ধড়ফড় করছিল, সে কি মেঘের ডাকে? নাকি ঠাকুর নেই শুনে? বুকের ভেতরে এক ভীষণ আন্দোলন।

—ঠাকুর নেই মানে ? —কাঁপা কাঁপা গলায় জিজ্ঞাসা করল ভক্তিমতী নারী।

মুখ নীচু করে একটুক্ষণ চুপচাপ, তারপর — যেতে আসতে দেখি আপনাদের দেওয়ালে শ্বেতপাথরের ফলক, — মহামহোপাধ্যায় ভবন — আপনারা নিশ্চয় উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ ?

—হ্যাঁ।

—আমি কিন্তু খুব নীচু জাতের, আমি যাই। —ঘুরে দাঁড়াল।

—এই বৃষ্টির মধ্যে কোথায় যাবেন ?

—আমার ছাতা আছে।

—ছাতায় এ বৃষ্টি মানবে না —

সহসা বিদ্যুতের তীর ঝলকে চরাচর আলোকিত, কয়েক মুহূর্ত, তারপর প্রচণ্ড আওয়াজে কেঁপে উঠল দুজনেই।

—উঃ ! মেঘেরা যেন পাগল হয়ে গেছে —মৃদু গলায় বলল কমলা।

—পাগল নয়, উন্মাদ —বলল সুকুমার- —উন্মাদ মেঘেরা আজ বাধাবে প্রলয় !

—পাগল নয় উন্মাদ ! বেশ ভালো বললেন তো।

কমলার কথা শেষ না হতে হতে পুণরায় গর্জন, কেঁপে উঠল কমলা।

—ভয় লাগে, লাগে ভয় —আনমনে বলল সুকুমার।

তীব্র ঝড়ে ভেজানো দরজা ধড়াম শব্দে খুলে গেল।

—বাঃ ! এতো কবিতা হয়ে গেল। —দরজা বন্ধ করতে করতে বলল কমলা, কিন্তু বাতাসের চাপে পারল না, সুতরাং খিল লাগিয়ে দিল।

—উন্মাদ মেঘেরা আজ বাধাবে প্রলয়,

ভয় লাগে, লাগে ভয় ... শব্দগুলি নিয়ে যেন আদর করছে এভাবে বলল কমলা —ভারি সুন্দর কবিতা হয়ে গেল।

—তাইতো।

—আপনি বসুন না।

—বসব ?

—কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন ? বসুন।

সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ করে পুরোনো আমলের বাড়ির প্রথামতো দুপাশে বসার রোয়াক, ওখানটা দেখিয়ে দিল কমলা। ইতস্ততঃ করে বসল সুকুমার। বিপরীত দিকে কমলাও বসল।

—কিন্তু মনে হচ্ছে যেন আপনি কবিতা লেখেন !

— কি যে বলেন! — মুখ নীচু করল সুকুমার, — কিন্তু আমাকে আপনি আপনি করছেন কেন? আমাকে ছোট ছেলেমেয়েরাও তুমি বলে।

— এটা মহামহোপাধ্যায় বাড়ি, আমাদের শিক্ষাদীক্ষা আলাদা। হ্যাঁ, কি যেন বলছিলেন? ঠাকুর নেই?

— ছিল, আমি গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে দিয়েছি, সেই ছেলেবেলায়।

— কেন?

— এক ব্রাহ্মণ আমাদের ছোটজাত ছোটলোক বলে গালাগালি দিয়েছিল। সেদিন মা খুব কেঁদেছিল।

— বাব্বাঃ, কি রাগ! — উচ্ছসিত হাসি ছড়িয়ে দিল কমলা — এক ব্রাহ্মণের দোষ সকলের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন! তা ঠাকুর কি দোষ করল?

— সেদিন বুঝেছিলাম ঠাকুর ওদের, নইলে ওদের দিয়ে পুজো করাতে হয় কেন?

— যাকগে ওসব কথা, ঝুরিভাজা খাওয়াবেন না?

এতক্ষণ ফুলের ব্যাগ হাতে ধরা ছিল, সেটা সযত্নে রেখে ঝুরিভাজা মাখতে বসল সুকুমার। বলল, — আপনি আমাকে তুমি করে বলুন, আমার অস্বস্তি লাগছে।

— সে হবেখন, কিন্তু এই যে আপনি নীচু জাত হয়ে সব উঁচু জাতের লোকেদের না জানিয়ে আপনার ছোঁয়া খাবার খাইয়ে সকলের জাত মারছেন তার কি হবে?

হাত ঘেমে গেল সুকুমারের, বলল — আপনি খাবেন না?

— পাগল! খুব হাসল সে — বেশি করে লেবু দিও কিন্তু!

বর্ষণ ও বজ্রের যৌথ অভিযান আজ বুঝি সব ওলটপালট করে দেবে!

— আজ তোমার ব্যবসা চোপাট — আঙুল চেটে খেতে খেতে বলল কমলা।

— সারাদিন ট্রেনে ট্রেনে ঘুরে ঘুরে কিবা আয়, এ ব্যবসা ছেড়ে দেব, ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিচ্ছি, খুব বেশি টাকার ব্যাপার নয়, ঝুরিভাজার প্যাকেট দোকানে দোকানে সাপ্লাই করব। ভাইকে বলেছি, লেখাপড়ার পাশাপাশি ব্যবসায় হাত লাগাতে হবে।

— আপনার বাড়িতে কে কে আছেন?

— আমি, আমার ভাই, তারপর এক বোন।

— ভাই কিসে পড়ে?

— এবার মাধ্যমিক দেবে।

— বোন?

— ক্লাস এইট।

— আর আপনি?

– উচ্চমাধ্যমিকটা উৎরেছিলাম। তারপর বাবা মারা গেল –

– তাহলে তো আপনার ওপর অনেক দায়িত্ব। বেশ ভালো লাগছে আপনার উদ্যোগ দেখে। আসলে ছেলেরা চেষ্টা করলে অনেক কিছু করতে পারে, মেয়েদের অনেক অসুবিধা, আমি কিছুই করতে পারিনা। আমাকে কিছু কাজ দিননা, অনেক ঝুরিভাজা ভাজতে আপনার তো লোক লাগবে, আমি যদি ভেজে দিই ?

– কি যে বলেন ! আপনার বাড়িতে আর কে আছেন ?

– আমি আর মা। কিছুই করিনা, কিছুই আয় নেই। যাকগে আমার কথা, আমার ফুলগুলোর কি গতি হবে তাহলে ?

– কেন, ঘরে সাজিয়ে রাখব। কিন্তু আপনার অভাব কি, আপনি তো সোনার খনির ওপর বসে আছেন !

– মানে ?

– এ বাড়ি তো ভেঙে পড়ার অবস্থা, সঙ্গে এতটা জমি, এখানে তো অলকাপুরী বানানো যায়। চাইলে অনেক টাকাও পাবেন, ঘরও পাবেন।

– অলকাপুরী, আহা মেঘদূতের অলকাপুরী – অস্ফুটে বলল কমলা।

– কি বলছেন ?

– আলকাপুরী মানে জানেন ?

– ঠিক জানিনা, আমার এক বন্ধু আছে প্রোমোটার, মাঝে মাঝেই বলে – 'অলকাপুরী বানিয়ে দেব', মানে খুব বড় আর সুন্দর বাড়ি আরকি ! আমার সঙ্গে ইস্কুলে পড়ত, জানেন, কিছুই ছিল না, কিন্তু ব্যবসা বুদ্ধি খুব, অনেক উন্নতি করেছে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কমলা কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল ওর চোখের দিকে, তারপর বলল – যদি আপনি নিজে এই অলকাপুরী তৈরি করতে পারেন তাহলে আমি পার্টনার হতে পারি।

– আমি ?

– কেন নয় ?

– অবশ্য ওর সঙ্গে থেকে অনেক কিছুই জানি – বাকিটা – হতে পারে।

– তাহলে আসুন।

– কোথায় ? – সম্মোহিত দৃষ্টি সুকুমারের।

– আসুন না !

নিয়ে এসে দাঁড়াল ঠাকুর ঘরের দরজায়, – কই আসুন, আমি কিন্তু ঠাকুর মানি।

– আমি – আমি –

দৃঢ়ভাবে হাত ধরে তাকে ভেতরে টেনে নিল কমলা, সুকুমারের চোখের দিকে তাকিয়েই রইল, মনে মনে বলল – আজকের ঝড় আমার অনেক কিছু উড়িয়ে নিয়ে গেছে, সব সংস্কার, সব চিন্তা ভাবনা পিছুটান।

– এখানে বসো, – বলল কমলা।

সম্মোহিতের মতো বসল সুকুমার, কমলা পাশে বসল, বলল – বলো, আজ থেকে আমি তোমার পার্টনার, হ্যাঁ, তুমি করেই বলো।

সুকুমার মন্ত্রমুগ্ধের মতো উচ্চারণ করল – আজ থেকে আমি তোমার পার্টনার।

– আজ থেকে আমি তোমার জীবনের পার্টনার – মৃদুস্বরে উচ্চারণ করল কমলা।

আকাশ গুরুগুরু শব্দে তাদের সমর্থন জানাল।

ষষ্ঠি
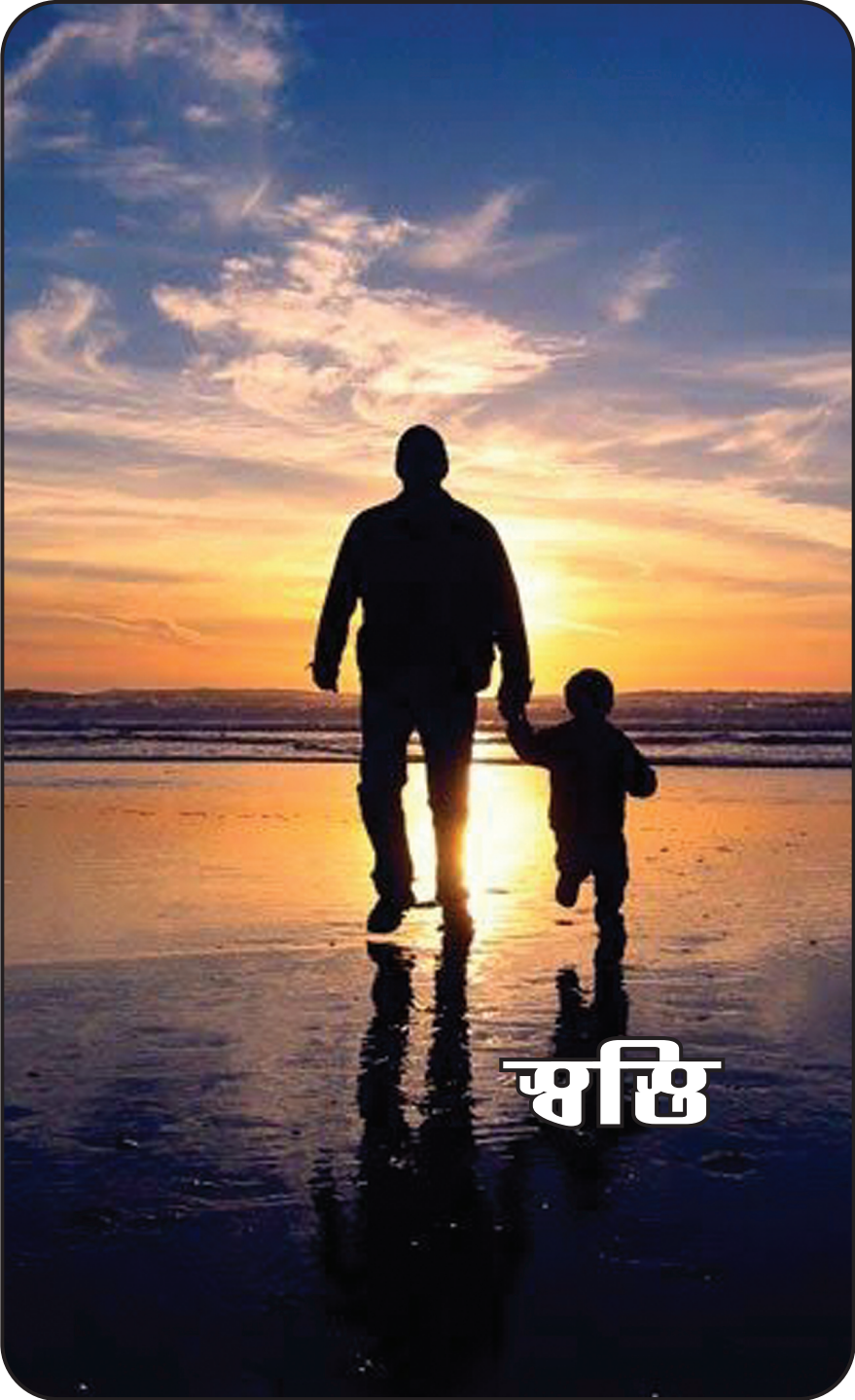
আমার নাম হাঁদা, ভাল নাম একটা আছে, কিন্তু সে নাম বললে গ্রামের লোক চিনবে না। আসলে ভালবাসায় এসব হয়। গ্রামের লোকে ভালবেসে ওরকম বলে থাকে - ভোঁদার ব্যাটা হাঁদা ! এ এক হাঁদার কাহিনী।

বর্তমানে আমি শহরে থাকি। শহরতলিতে একটা ছোট ফ্ল্যাট কিনেছি। চাকরির সুবিধা আর আমার বৌয়ের ইচ্ছাও বটে ! এর জন্য অবশ্য সে বাবার থেকে কিছু টাকা এনেছে। আমার বাবাও কিছু দিয়েছেন, আর আমার কিছু জমানো ও কিছু ধার।

আমি কমার্স গ্র্যাজুয়েট, প্রাইভেট কোম্পানীতে সাধারণ চাকরি করি, আমার স্ত্রী গৃহবধূ, আমার পুত্র দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র। আমি স্ত্রী পুত্রের প্রতি কর্তব্যপরায়ণ। যথাসাধ্য রোজগার করি। মাঝে মাঝে ওভারটাইমও করে থাকি। আমার প্রভিডেন্টফান্ড, গ্র্যাচুয়িটির নমিনি আমার স্ত্রী, ব্যাঙ্কের টুকটাক ফিক্সড ডিপোজিট - সেও স্ত্রীর সঙ্গে যৌথ ভাবে। আমি স্ত্রীকে ভালবাসি, আমাদের দেখাশোনা করেই বিবাহ হয়েছে, সন্তান আমার চোখের মণি !

আমার চাহিদা সীমিত, এই আট বছরের বিবাহিত জীবনে একবার পুরী ও একবার দীঘা বেড়াতে গিয়েছিলাম। এছাড়া কখনসখন তারকেশ্বর বা দক্ষিনেশ্বর ঘুরতে যাই। স্ত্রী ও সন্তানের জন্য মধ্যমানের পোশাক কিনেই সন্তুষ্ট থাকি, নিজের জন্য আরো কম। আমার সব চাহিদাই সীমিত, খাবার চাহিদা, পরার চাহিদা, এমনকি শারীরিক চাহিদাও। সকালে খেয়েদেয়ে টিফিন নিয়ে অফিস যাই। সন্ধ্যায় ফিরে চা টা খেয়ে ছেলেকে নিয়ে পড়াতে বসি, তখন স্ত্রী পাশের ঘরে টিভি দেখে। আমি কখনসখন টিভিতে সিনেমা দেখি। সব মিলিয়ে আমি মোটামুটি সুখী মানুষ (ছিলাম)। কিন্তু !

এই একটা কিন্তুর পিছনে আমি গত তিন মাস ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমাদের এই সস্তার ফ্ল্যাট বাড়িতে কোন পাহারাদার নেই। চারতলা বাড়িতে মোট আটটা ফ্ল্যাটে যে যার সিকিউরিটি নিজের কাছে। নীচে কোলাপসিবিল গেটে রাত্রি দশটায় তালা পড়ে। তালা দেন নীচের ডানদিকের ফ্ল্যাটের কালীবাবু। সকলের কাছেই ডুপ্লিকেট চাবি আছে, প্রয়োজনে ব্যবহার করেন। কালীবাবুর নীচের তলার ফ্ল্যাটে দরজার সঙ্গেই লাগোয়া জানালা সবসময় খোলাই থাকে। উনি রিটায়ার্ড মানুষ, স্ত্রী গত, ছেলে-বৌমা চাকরিতে চলে যান। হাঁটুতে ব্যাথা তাই বিশেষ কোথাও যাননা, দিনের বেশীর ভাগ সময় জানালার ধারে বসেই কাটিয়ে দেন, কাউকে কাউকে ডেকে কথাটথা বলেন।

একদিন কালীবাবু আমাকে ডেকে বললেন - বলতে গিয়ে বেশ কয়েকবার ঢোক

গিলে কিন্তু কিন্তু করে তারপর বললেন - আচ্ছা, মাঝেমাঝে দুপুরবেলা লম্বামতো এক ভদ্রলোক চোখে রিমলেস চশমা, সরু গোঁফ আপনাদের ফ্ল্যাটে আসেন, উনি কি আপনার ভাইটাই কেউ হন ?

আমি ঘাবড়ে গেলাম – জানিনাতো !

– সে কি? আমি একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, – কোন তলায় যাবেন? বললেন চার তলায় ডান দিকের ফ্ল্যাটে – আজও এসেছিলেন।

চারতলায় উঠতে উঠতে মন হু হু করতে লাগল, ওই চশমা আমি চিনি, স্ত্রীর কোন সম্পর্কের দাদা না কি যেন, সুব্রতদা –

ওনাকে প্রথম দেখেছি বিয়ের সময় ছাদনা তলায় কনের পিঁড়ি ধরতে। এক দিকে বড় শালা আরেক দিকে উনি, বৌ দুহাত দিয়ে দুজেনর কাঁধ জড়িয়ে ধরেছিল, অপরিচিত ওনাকে আমার কেমন যেন লেগেছিল। কেন বোঝাতে পারবনা, কেমন এক অস্বস্তি –

গ্রামের বাড়ি থেকে অফিস করতে আমায় সকাল ছটায় বেরিয়ে রাত্রি দশটায় বাড়ি ফিরতে হতো, তাই বিয়ের পর এখানে শ্বশুর বাড়ির কাছাকাছি একটা বাসা ভাড়া নিয়ে থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল, তখন ওনাকে দুএকবার দেখেছি, তখনো কেমন এক অস্বস্তি লাগতো। তারপর এই ফ্ল্যাট – এখানে এসেছি বছর তিনেক, এখানে উঠে আসার সময় বড় শালার সাথে উনিও সহযোগিতা করেছিলেন, কিন্তু তখনো ওই অস্বস্তি ভাব ! এখন শুনছি মাঝেসাঝে আসেন অথচ আমি জানিনা ! আমার মাথা ঝিমঝিম করছিল। ঘরে ঢুকে কিন্তু আমি কিছুই বলতে পারলুম না। অথচ বুকের মধ্যে তোলপাড় ! শেষে খেতে বসে মরিয়া হয়ে বলে ফেললাম – আজ সুব্রতদা এসেছিলেন ?

স্ত্রীর মুখের কিরকম একটা অবস্থা, দেখে আমার অনেক কিছু মনে হতে লাগল, সামলে নিয়ে বলল – হ্যাঁ, ওই নেমন্তন্ন করতে এসেছিল।

– কিসের ?

– ওই, অনেক দিন যাইনি - তাই।

রাতে ছেলে ঘুমিয়ে পড়লে আমি মরিয়া, যদিও আমার মধ্যে কোন দৈহিক চাহিদার লেশ মাত্র নেই তবু আমি স্ত্রীকে উন্মুক্ত করতে চাইলাম, যেন খুঁজেপেতে খুঁড়েখাঁড়ে দেখে নেব ব্যাভিচারের চিহ্ন সকল ! কিন্তু স্ত্রীর প্রচণ্ড অনীহা, বলল – শরীরটা ভাল নেই। একটা শীতল স্রোত আমার পা বেয়ে ক্রমশ শরীরকে গ্রাস করছিল। বড় অসহায় লাগছিল। সারারাত ঘুমাতে পারলাম না, যদিও চুপচাপ শুয়ে

রইলাম। মনে হচ্ছিল স্ত্রীও ঘুমায়নি, কিন্তু পাথরের মতো অনড়, তাই সন্দেহ আরো তীব্র, তাহলে ?

সকালে স্ত্রী যখন স্নান ঘরে আমি ওর মোবাইলের কল লিস্ট দেখলাম, সু দা - নামে একটি কল পরশু দুপুরে, একটি গতকাল দশটায় – অর্থাৎ আমি বেরিয়ে যাবার পর। সব কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল।

পরদিন সকালে আবার দেখলাম, হ্যাঁ, দুপুরে কল করা হয়েছে, অর্থাৎ সব জানিয়ে পরামর্শ হয়েছে। এ কার ঘরে আমি বাস করছি ? এ কি ওদের ঘরে আমি আশ্রিত ? বস্তুত এ ফ্ল্যাটও তো স্ত্রীর নামে !

আমার জীবনের সমস্ত কিছু ওলট পালট হয়ে গেছে। বাজার করছি, রান্না হচ্ছে, খাচ্ছি, অফিস যাচ্ছি, বাড়ি ফিরে জলখাবার খাচ্ছি। ওপর ওপর সব ঠিকঠাক আছে, কিন্তু কিছুই ঠিক নেই। আমার শরীরের অর্ধেক অনুভূতি যেন পাথর হয়ে গেছে। না ঠিক তা নয়, কখনো অনুভূতি এতো তীব্র হয়ে ওঠে! যেমন ছেলেকে পড়াতে বসলে। সমস্ত শরীর আনচান করে, আমি পড়ানো ভুলে যাই, ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি, মনে হয় এ ছেলে কি আমার ? ওর মুখটা কার মতো দেখতে ? ছেলে বলে – কি হলো, ও বাবা ?

– না কিছু না – বলি আমি।

– অমার কেমন ভয় লাগছে, ও বাবা – ছেলে কেমন করে যেন তাকায়। আমি ওকে কোলের কাছে টেনে নিই।

এরকম দুতিন দিন হয়েছে, তারপর থেকে আমি সাবধান হয়ে গেছি।

রাতে ছেলে দুজনের মাঝখানে শোয়, কিন্তু বেশিরভাগ সময়ই আমার ঘাড়ে পা তুলে আমাকে জড়িয়ে শোয়, আমি ছেলেকে খুব ভালবাসি, কিন্তু –

এখন আমি আর স্ত্রীকে ছুঁতে পারিনা। কত কিছুই পারিনা। কোন কোন দিন অফিস থেকে ফিরলে স্ত্রী হাসিমুখে দাঁড়ালে আলতো একটা চুমু খেতাম, এখন সেটা আর হয় না। কোন কোন ছুটির দিনে একটু বেলায় বলতাম – কি গো আর এক কাপ চা হবে ? – এখন আর বলতে পারিনা। সত্যি কথা বলতে কি কথা বলাই এখন প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে।

তিন মাস কেটে গেছে, কিন্তু এই তিনমাস সেই নিমন্ত্রণের আর কোনো উল্লেখ হলো না। নিজেকে কেমন অসহায় মনে হয়। সারাক্ষণ মনে হয় আমি এক খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছি, কি একটা আতঙ্ক আমাকে সারাক্ষণ তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। এখন আমি বুঝতে পারি কেন এই অস্বস্তি ! আসলে মন একটা কিছু জানান দেয়।

ভালবাসা কাকে বলে? আমি তো ভাবতাম এই যে অফিস থেকে ছুটি হলেই বাড়ি ফেরার জন্য মন আনচান – স্ত্রীকে দেখার জন্য – এটাই ভালবাসা। আমি ভাবতাম আমার মতো স্ত্রীরও অমন হয়। তাহলে ওই সম্পর্কটা কি? ওটাই তাহলে ভালবাসা, আমার সঙ্গে সবটাই মেকি।

এখন বেশিরভাগ রাতেই আমার ঘুম হয়না। যেদিন খুব ক্লান্ত থাকি ঘুমিয়ে পড়লেও অল্প সময় পরেই ঘুম ভেঙে যায়। মাথার মধ্যে কুরে কুরে খাওয়া যন্ত্রণাটা জেগে ওঠে। পথে যেতে যেতে, অফিসে কাজের মধ্যে, সারাক্ষণ ওই এক চিন্তার যন্ত্রণা!

বিশেষতঃ যখন মনে পড়ে প্রথম দৈহিক মিলনের কথা – যেটা আমার কাছে ছিল একটা আবিষ্কার – সেটা স্ত্রীর কাছে ছিল নেহাতই একটা ছেলেমানুষী, এবং বর্তমানেও! আসল রমণটা হয়ত জমজমাট ওখানে, আর আমি নেহাতই একটা কেন্নোর মতো – আঃ কি যন্ত্রণা!

কেন্নোরা কেমন অনায়াসে – অথবা কুকুরেরা – অনায়াসে মিলিত হয় যে কারো সাথে! কিন্তু সন্তান? এখানেই – মানুষ তো আর কুকুর নয়। আমি আমার সন্তানকে ভালবাসি। আমার সন্তান? ভাবতে কপাল ঘেমে ওঠে। ছেলে যখন ভয় পেয়ে আমাকে আঁকড়ে ধরে পরম নির্ভরতায় আর আমি তাকে আশ্বাসে কাছে টেনে নিই, কিংবা আনন্দে গলা জড়িয়ে সুখি হই – কিন্তু এখন এক আড়ষ্টতা আমাকে আচ্ছন্ন করে, ছেলে অবাক হয়ে যায়। ইস এ কোন কুত্তির সাথে ঘর করি আমি – চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা হয় আমার, কিন্তু বলতে পারিনা।

– আমি ঘেন্না করি, তোকে আমি ঘেন্না করি – এভাবে সারাক্ষণ মনে মনে গর্জন করি, কিন্তু ছেলেকে পারিনা, বরং চোখে জল এসে যায়।

আজ সাত সকালে কলিং বেলের আওয়াজে দরজা খুলে দেখি মা দাঁড়িয়ে – আজ দশহরা, ফার্স্ট ট্রেন ধরে চলে এলুম গঙ্গাস্নান করব বলে – মা বলল, ঘরে ঢুকে বিছানায় নাতির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, বিছানায় হাত পা গুটিয়ে আঘোরে ঘুমিয়ে ছেলে, এ এক অদ্ভূত শোওয়া ওর! মা কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে কাছে গিয়ে আলতো করে মাথায় হাত বুলিয়ে দিল, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল – একেবারে ছেলেবেলার তুই! এমনই ভাবে শোওয়া ছিল তোরও, আর ওর মুখটাও একেবারে তোর মুখের ছাঁচে ফেলে গড়েছে ভগবান!

ছি ছি টি.ভি. উপাখ্যান

Dialogue তৈরি করতে ওস্তাদ আমার পিসিমণি! আচ্ছা শব্দটা কি ওস্তাদিনী হবে? আসলে আমি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে উঠলাম সবে সাতদিন হল। লেখক হওয়ার ইচ্ছা আমার সেই ক্লাস এইট থেকে। তখন একটা গল্পও লিখে ফেলেছিলাম—সাধন স্যারের ব্রহ্মাস্ত্র। সেটা স্যারের ওপর প্রচণ্ড রাগ করে লিখেছিলাম। কিন্তু সে অন্য কথা। যে কথা বলছিলুম—সদ্য পরীক্ষা শেষ হয়েছে, এখন দারুণ অবসর, জমিয়ে একটা গল্প লিখব ভেবেছি। কিন্তু কি নিয়ে? তো মাথায় এসে গেল পিসিমণির কথা। কিন্তু গুরুজন সম্পর্কে এমন মন্তব্য করা কি ঠিক? তবে লেখক হতে গেলে অতসব ভাবলে চলে না। আর গল্পেতো আমি পিসিমণি করে লিখব না।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম—কোথাও যদি একটু বিবাদের গন্ধ পাওয়া যায় ওমনি পিসিমণি ঝাঁপিয়ে পড়ে এমন চোখা চোখা সংলাপ দিয়ে সাজিয়ে পড়িয়ে দেবে যে লিকলিকে মোমবাতির আগুন একেবারে দাউ দাউ দাবানল হয়ে যাবে। আহা, আধুনিক মেগাসিরিয়ালের পরিচালকরা যদি পিসিমণির সন্ধান পেতেন তো দরজায় হত্যে দিয়ে পড়ে থাকতেন। যাকগে, একটা উদাহরণ দিই।

সেদিন পিসিমণি বলল—হ্যাঁরে ভোম্বল, পাশতো তুই ভালভাবেই করবি জানি, তা কোন কলেজে ভর্তি হবি?

—লালবাবা কলেজে— বললাম আমি।

—সে কি রে? কোলকাতার অমন ভাল ভাল কলেজ থাকতে হাওড়ার লালবাবা! কেন রে?

—বাবা বলেছে।

—ও মা! কথায় বলে যার নেই কোন বাবা সে যায় লালবাবা! বন্ধুদের মুখ দেখাবি কি করে?

—তা কি করব? বাবা বলেছে।

—একটু ভেবে পিসি বলল—বাবাকে বলে দিবি—তুমি আমার জীবনটা নষ্ট করে দেবে। কি বলব, আমি চুপচাপ শুনলাম।

—কি রে বলবি তো? আমি তোর সঙ্গে আছি, চিন্তা করিস না।

আমি আস্তে করে ঘাড় নাড়লাম।

—কি আক্কেল তোর বাবার। একটা মাত্র ছেলে তাকে কোথায় ভাল কলেজে পড়াবে তা না!

—বাবা বলছিল পরীক্ষাটা তো কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের, তা যে কলেজেই

পড়! আসলে বাড়িতে ভাল করে পড়াশোনাটা করতে হবে, তার জন্য টিউটরের কাছে যাও! ভাল দেখে ব্যবস্থা করবে বলেছে।

—এই সব বলেছে? হুঁ! ভাল কলেজের ভাল প্রফেসর, ভাল লেকচার-এসব কিছু নয়! তুই বলে দিবি—তুমি আমার জীবনটা নষ্ট করে দেবে। এমন ভাল ছেলে! শোন, কাল চিলি চিকেন আর পরোটা বানাবো, সন্ধ্যেবেলা চলে আসবি, কেমন? আরো কয়েকটা কথা শিখিয়ে দেবো। বলবি বাবাকে বেশ ভাল করে।

আমি একটু খাওয়ার লোভী। আমাকে লোভ দেখিয়ে গেল বুঝলাম। আরও কিছু চোখা চোখা 'ডায়লগ' শিখিয়ে দেবে বুঝলাম। কিন্তু এসব কথা কি বাবাকে বলা যায়? না উচিত? আসলে বাবার সঙ্গে পিসিমার দারুণ বিরোধ। আমাকে দিয়ে বাবাকে টাইট দিতে চাইছে।

পিসিমণির বাড়ি পাশের পাড়াতে। প্রায় নিত্য যাতায়াত আছে। পিসিমণির নাম অর্চনা, বাবা নাম দিয়েছে চর্চিতা। মাঝে মাঝেই চর্চা করতে চলে আসে। চর্চা করতে খুব ভালবাসে। এক একদিন সন্ধ্যেবেলা গরমগরম তেলে ভাজা আর মুড়ি কিনে নিয়ে চলে আসবে, তারপর মায়ের সঙ্গে বসে মুড়ি খেতে খেতে গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর নানা চর্চা! জেঠিমা ওসবে পাত্তা দেয় না। কিন্তু মা খুব শোনে।

ওপাড়ায় নন্দীবাবু বাবার খুব বন্ধু। তাঁর মেয়ের বিয়েতে বাবা মায়ের নিমন্ত্রণ ছিল। বাবা গেল, মা গেলনা। কারণ ওই! পিসিমণি! একদিন এসে মাকে বলেছে নন্দীবাবুর স্ত্রী তোমাকে দুচক্ষে দেখতে পারে না। অষ্টমীর দিন নাকি পুজো প্যান্ডেলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাজার লোকের মাঝে তোমার সমালোচনা করছিল। তোমার নাকি বড্ড দেমাক! কি এমন গান করে তার আবার অহঙ্কার!

মা বাবাকে সেই কথা বলল—তোমার নন্দীবাবুর স্ত্রী এইসব বলেছে, আমি ওদের নেমন্তন্নয় যাবো না। বাবা মা কে কত করে বোঝাল, কিন্তু বিফল। বাবাকে একটা মোক্ষম ধাক্কা দিল পিসিমণি!

আমি মাকে খুব ভালবাসি। মায়ের এমন হেনস্থা দেখলে আমার খুব কষ্ট হয়, কিন্তু পিসির এসব বানানো কথা নিয়ে মাকে আমি কিছু বোঝাতে গেলে উল্টো ফল হবে। তাই কিছু বলিনা।

যাই হোক মাকে ভোলাবার জন্য আমি বললাম—আজ আমি সকলকে বিরিয়ানি খাওয়াবো। মা গুম হয়ে বলল—আমি খাবো না।

এটা আন্দাজ করেছিলুম। মা আজ কিছু না খেয়েই শুয়ে পড়বে, তাই এই প্রস্তাব দিয়ে জেঠিমাকে সাক্ষী মানলাম—দেখ জেম্মা, মা খাবে না বলছে।

জেন্মা বললেন—কেন খাবি না? ঠাকুরপো তো ভাল ভাল খেয়ে আসবে, ভোম্বল যখন খাওয়াবে বলছে আনুক বিরিয়ানি, আমরাও ভাল খাবো।

—শোন্ ভোম্বল, এখনই অর্ডার দিয়ে আয়, ভাল পিস্ মাংস দিয়ে যেন রাখে, সাড়ে নটার সময় গরম গরম নিয়ে আসবি, আর শোন, ওই ডিম আর আলু না দিয়ে রাইস যেন বেশি দেয়, আমি আলু দিয়ে কসাকসা ডিমের কারি বানাবো।

জেঠু বললেন—আমি রাজভোগ আর আইসক্রিম সন্দেশ আনবখন।

বাঃ! ফাটফাটি ব্যাপার, আমি লাফাতে লাফাতে চলে গেলুম। জেন্মার কথা মা ফেলতে পারবেনা। বিরিয়ানির অর্ডার দিয়ে ফেরবার সময় জগার দোকানে চারটে ডবল সাইজ ভেজিটেবল চপ্ করে রাখতে বললুম, সাড়ে নটার সময় গরম ভেজে দেবে। ফ্রিজে জেন্মার ভাল ভাল চাটনি করাই থাকে!

জেঠতুতো দিদির বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর এখন আমাদের ফ্যামিলি মেম্বার পাঁচজন। এই দিদিকেও পিসি সুযোগ সুবিধা মতো ভুজুংভাজুং দেয়। হয়ত শাশুড়ির সঙ্গে কিছু খিটিরমিটির হলো, দিদি বাবুসোনাকে কোলে নিয়ে চলে এলো, দুদিন পরই আবার চলে যাবে, বা জামাইবাবু এসে নিয়ে যাবে, বা হয়ত শাশুড়ি ফোন করবে—

কিন্তু পিসি ঠিক গন্ধে গন্ধে হাজির, ফুসুর ফুসুর করে দিদিকে ‘ডায়লগ’ তৈরি করে শিখিয়ে দেবে— শাশুড়িকে এই বলবি! শাশুড়িকে ওই বলবি। জেন্মা চোখ পাকিয়ে একদিন বললেন—ও শাশুড়িকে কি বলবে তোমায় শেখাতে হবে না, তুমি বরং তোমার মেয়েকে এখন থেকে শেখাও বিয়ের পর কাজে লাগবে।

পিসির একমাত্র মেয়ে অম্বালিকা, ডাকনাম অমলা, একটু গম্ভীর চালচলনে, দেখতে বেশ ভাল। অবশ্য আমার মনে হয় দেমাকী! তার বিয়ে ঠিক হয়ে গেল কিন্তু বাবার যোগাযোগে।

বাবার কাছে ব্যবসার যোগাযোগে নানান মানুষ আসেন, একদিন বাইরের ঘরে তেমনই একজন সেনগুপ্তমশাই কথা বলছেন—তখন অমলাদি এসেছে, সেনগুপ্ত মশায় দেখে বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছেন—মেয়েটি কে? তারপর কথায় কথায় তাঁর ছেলের জন্য বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন। কলকাতার শ্যামবাজারের বনেদী পরিবার।

বিয়ে হয়ে গেল। কি ভাল ভাল খাবার যে হয়েছিল! জামাইবাবু শুভেন্দু দেখতেও যেমন সুন্দর ব্যবহারও তেমনি অমায়িক। সব সময় হাসিখুশি। আমার তো খুব ভাল লেগে গেল। দুদিনেই ভাব হয়ে গেল খুব। এরপর আবার অষ্ট মঙ্গলায় এলে দেখা হবে। আমি পিসিমণিকে আগেভাগে বলে রাখলুম সেদিন দুপুরে জামাইবাবুর সঙ্গে খাবো।

—সেটা কি তুই বলবি তবে? আমিই তোকে বলব ভেবে রেখেছি।

অষ্ট মঙ্গলার দিন সকাল হতেই পিসির বাড়ি হাজির হয়ে গেলুম। বাজার করতে পিসেমশায়কে একটু হেল্প করা দরকার। বাজারে গিয়ে ইয়া বড় বড় সাইজের চিংড়ি কেনা হলো, পিশেমশায়ের পছন্দ পাবদা মাছ তাও কেনা হলো, রেওয়াজি মটন্—

বাজার থেকে সবে ফিরেছি সাড়ে ন'টা বেজেছে কিনা, দিদি জামাইবাবু এসে গেল। কিন্তু বাড়িতে ঢুকে কারও সঙ্গে কোনো কথা বলা নেই কওয়া নেই গম্ভীর মুখে পিসেমশায় পিসিমাকে কোন রকমে প্রণাম করে আসছি বলে ব্যস্তভাবে বেরিয়ে গেল। আমি হেসে এগিয়ে গেলুম, কিন্তু আমাকে যেন দেখতেই পেল না। ভাব ভঙ্গীটা খুব সন্দেহজনক।

পিসেমশাই বললেন—কি হলো শুভেন্দু?

পিসিমণি—কি হলো বাবা শুভ? কোথায় যাচ্ছ?

কিন্তু জামাই ফিরেও তাকাল না।

—ও ভোম্বল, দেখনা বাবা এগিয়ে—

আমি ছুটলুম, দেখি ট্যাক্সি দাঁড় করানোই ছিল, উঠে পড়েছে, আমি ডাকতে ডাকতে গাড়ি বেরিয়ে গেল। মুখ চুন করে ফিরে এসে তাই বললুম।

পিসেমশাই পিসিমণি দিদিকে নিয়ে পড়ল কি হয়েছে— কিন্তু দিদি শুধু ফ্যাঁচ্ ফ্যাঁচ্ করে কেঁদেই চলেছে, কিছুই বলছে না। দেখেশুনে আমি চুপচাপ কেটে পড়লুম। ব্যাপার স্যাপার বেশ গুরুতর মনে হচ্ছে!

রবিবার। জেঠু, বাবা, সকলেই বাড়িতে। মা জিজ্ঞাসা করল—কিরে মুখটা অমন কাচুমাচু? চলে এলি কেন?

—জানি না; জামাইবাবু দিদিকে রেখেই বেরিয়ে গেল, ট্যাক্সি দাঁড় করিয়েই রেখেছিল। দিদি কিছু বলছে না, শুধুই কাঁদছে।

মা ফোন করল, দু-একটা কথা বলল, — একটু পরে ফোন করবে বলছে। পিসি এলো ঘণ্টা দুয়েক পরে, একেবারে বিধ্বস্ত অবস্থা, কেঁদে পড়ল বাবার কাছে, বলল-বলেছে- দুলাল বাবুকে বিকালবেলা পাঠিয়ে দেবেন, যা বলবার ওনাকেই বলা হবে।

—অমলা কি বলছে? বাবা জিজ্ঞাসা করল।

—ভেঙে কিছু বলছে না, শুধু এটুকু বলল—এতদিন কেউ ওর সঙ্গে কথা বলেনি, রাঁধুনি মেয়ে খেতে দিয়েছে, একা ঘরে থেকেছে, জামাই কোথায় ছিল দেখা পর্যন্ত করেনি।

—কি সর্বনাশ ! বাবা বলল—আমার হাত দিয়েই বিয়েটা হলো, আর—

তিনটে না বাজতে বাজতেই বাবা বেরিয়ে পড়ল। শ্যামবাজারে যেতে আর কতক্ষণ লাগে ! এক ঘণ্টাও না ! তারপর কতক্ষণ লাগবে আলোচনা ? এক ঘণ্টা ? তাহলে ? ছটা...সাতটা...আটটা...নটা—বাবাকে কি আটক করে রাখল নাকি? তারপর সকলে যখন টেনশনের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেও হতাশ হয়ে গেছে, বাইরের ঘরে এসে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে তখন রাত্রি দশটার সময় দেখা গেল বাবা আসছে।

সকলে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল বাবার ওপর, কি হলো ? কি হলো ? হাত-পা ছড়িয়ে সোফায় অর্ধশায়িত হয়ে বাবা বলল—বাবাঃ! একেবারে গলা পর্যন্ত ঠেসে খাইয়েছে।

—তোর কি এখন খাওয়ার গল্প শোনানোর সময় হলো? জেঠু অবাক হয়ে বললেন—এমন এক জীবনমরণ সমস্যা।

—বলছি বলছি, এক গ্লাস জল দাও।

জল খেয়ে বাবা রহস্যগল্প বলার মতো শুরু করল—

সি.সি.টি.ভি. দেখে এলাম। ঢাউস টি.ভি. বৈঠকখানায়, তার সামনে বসিয়ে বেয়ান সি.সি. টি.ভির ফুটেজ দেখাল।

—মানে ?

—মানে বৌভাতের দিন যেখানে বউকে বসানো হয়েছিল সেখানে সি.সি.টি.ভির ক্যামেরা লাগনো ছিল। বেয়ান তার মাকে-মানে অমলার দিদি শাশুড়িকে হাত ধরে নিয়ে এলেন, হেসে হেসে বললেন—এই তোমার দিদি শাশুড়ি। অমলা হাত জোড় করে নমস্কার করল। বেয়ান বললেন—প্রণাম কর? অমলা আরেকবার হাত জোড় করে নমস্কার জানিয়ে বলল—এইত করলাম, এর বেশি সম্ভব নয়। তখন বন্ধুরা ডাকছে। বন্ধুদের সঙ্গে 'সেলফি' তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

দিদিশাশুড়ি হতভম্ভ হয়ে এর মুখ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আঁচলের খুঁটে বাঁধা কিছু একটা বার করতে গেল, বেয়ান তাঁর হাত ধরে প্রায় টেনে নিয়ে চলে গেলেন।

নানান পদের খাবার আসছে আর বার বার 'রিপিট ব্রডকাষ্ট'। খাবার আর ছবি— দুটো মিলে গিলতে গিলতে আমার অবস্থা কাহিল। তার ওপর বেয়ান কানের কাছে বলে চলেছে— সেই ছোট্ট থেকে নাতিকে মা আমার কি ভালই বাসে ! তখন থেকে নাতবৌ নাতবৌ ! কবে নাতবৌ আনবিরে পাগলু ? তার জন্য আমি সাতভরির সাতনরী হার গড়িয়ে রেখেছি !

—মা, ছোটবেলায় দিদা কেমন আমার জন্য হাঁড়ির মুখে কাপড় বেঁধে গ্রাম থেকে জিওল মাছ আনত মনে আছে? —মায়ের পাশের দাঁড়িয়ে জামাই ফুট কাটছিল।

—সে কি ভোলবার বাবা! ছোলার পাটালি, মুড়ির মোয়া, কুলের আচার—বেয়ান মনে করিয়ে দিচ্ছিল।

আর সেই নারকোল বেটে চন্দ্রপুলি! আহা! কি গো দিদা, একদিন করো না চন্দ্রপুলি! জামাই আরো বায়না জানাচ্ছিল।

—তা দিদিমা কি করছিলেন? জেম্মা বললেন।

—আমি তো একটা ভাল কাজ করে ফেলেছি, গিয়েই ওনার পায়ে হাত দিয়ে একটা প্রণাম করে ফেলেছি। তিনি শুধুই বলছিলেন যাক্‌গে যাক্‌গে! আক্ষেপ করছিলেন—সেই কোন যুগে আমি নাতবৌয়ের জন্য সাতভরির সাতনরী হার তৈরি করে রেখেছি!

—সাতভরির সাতনরী? মা দুবার ঢোক গিলে বোধহয় হিসেব করে ফেলল—সে তো প্রায় দু-লাখ টাকার ওপর।

—তবেই বোঝো! —বাবা বলল—কেমন ঘরে বিয়ে দিয়েছি!

আহা! পিসিমণির কথা তো বলাই হয়নি, পিসিমণি সেই যে কোণের চেয়ারে চুপটি করে গালে হাত দিয়ে বসে আছে একটিও কথা নেই। পিসেমশাই আসেননি, মেয়েকে একা বাড়িতে রেখে আসা ঠিক নয়, তার কাছে রয়েছেন।

—তা এখন ওদের বক্তব্যটা কি? জেঠু বললেন।

—সেনগুপ্তবাবু কম কথার মানুষ। প্রায় বছর দশেক ওনার সঙ্গে যোগাযোগ। এক কথাতেই বিয়ে ঠিক করেছিলেন। চুপচাপ বসেছিলেন, শেষে বললেন—আমার দুর্ভাগ্য আমি নিজে দেখে বিয়ে ঠিক করেছি, কিন্তু এমনটা হবে ভাবিনি। বনেদী বাড়ি বলে আমাদের একটা সুনাম আছে, এ বাড়িতে ঘর সংসার করতে গেলে আচার ব্যবহার নম্রতা ভব্যতা—কি আর বলব! খুব হতাশ হয়ে পড়েছেন ভদ্রলোক।

—তুই কি বললি? —জেঠু জিজ্ঞাসা করলেন।

—আমি তার হাত দুটো ধরে বললাম—এভাবে বলবেন না, শিখিয়ে পড়িয়ে নেবেন।

—কিন্তু ওই যে কথাটা— সম্ভব নয়—উনি বললেন।

সব সম্ভব হবে, আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, আমাদের বাড়ির কালচার তো এরকম

নয়, ঠিক কি জন্য ও এমন কথা বলে ফেলেছে আমাকে একটু জানতে দিন, এইতো, আমি এসেই মা কে প্রণাম করলাম, আমরা এমনই অভ্যস্ত, ওর বন্ধুরা এসেছিল তাদেরও জিজ্ঞাসা করব।

—এতদিন ধরে আমি রোজই ফোন করছি,—এতক্ষণে কথা বলল পিসিমণি—বলেছে ভাল আছি, বলেই ফোন কেটে দিয়েছে।

—মেয়েকে শিক্ষা দিয়েছ—শশুরবাড়ি গিয়ে প্রথম থেকেই নিজের ডাঁটে থাকবি, না হলে সবাই তোকে দাবিয়ে চলবে—বাঁকা বাঁক করে বলল বাবা, প্রথম থেকেই ডাঁট দেখাতে গিয়ে আরও ডাঁটের ডান্ডায় পড়ে যাবে ভাবেনি তো!

—ওসব কথা থাক, এখন কি করে কি হবে তাই বল—জেঠু বললেন।

—সে আমি রাস্তায় আসতে আসতে ভেবে ফেলেছি, কিন্তু বাড়ি গিয়ে মেয়েকে শেখাতে বল আমি যা যা বলব ঠিক তাই তাই করতে হবে, একচুল এদিক ওদিক হলে চলবে না, তা যদি হয় তাহলে আমি দায়িত্ব নেবো—গম্ভীর গলায় বাবা বলল।

—তোমার পায়ে মাথা ঠুকে বলছি তাই হবে— বলতে বলতে পিসিমণি মাথা ঠোকে আর কি! বাবা তাড়াতাড়ি উঠে পালাল।

পরের দিন সকালেই ওনাদের ফোন করে কি সব বলল বাবা, শেষে বলল—বিকেল বেলা আমি মেয়েকে নিয়ে যাচ্ছি সেনগুপ্তবাবু, আমি মেয়েকে যা যা করতে বলল তাই করবে, আপনারা দয়া করে বাধা দেবেন না। মা,—মানে আপনার শাশুড়িমা আছেন তো? উনি যেন অবশ্য থাকেন। আমি মেয়ের সঙ্গে কথা বলেছি, সাক্ষাতে সব বলব।

বিকাল বেলা বাবা বলল—চল ভোম্বল দিদির বাড়ি। অমলাদি কে ডেকে নিল। বেচারীর সাজগোজ কিচ্ছুই নেই, একটা সাধারণ তাঁতের শাড়ি পরে এসেছে। হে ভগবান দিদি যেন শ্বশুরবাড়ি গিয়ে সকলের মন জয় করে নেয়!

ট্যাক্সিতে যেতে যেতে বাবা দিদিকে খুব বোঝাল—আমি যা যা বলব স্বাভাবিক ভাবে করবে, খুব সাবধান, বিরক্তি হচ্ছে যেন মনে না হয়। তুমি যখন গিন্নি হবে তখন তোমার হুকুম চালাবে, সেই জায়গাটা ধীরে ধীরে করে নিতে হবে বুদ্ধি দিয়ে। অনেক কিছু ভাল না লাগলেও করতে হয়, তবে সব কিছুর মধ্যে ভাললাগাটা জড়িয়ে নিতে পারলে ভাল হয়।

ওনাদের বৈঠকখানা সত্যি অর্থে বৈঠকখানা! বেশ বড়। আর পুরানো আসবার সাজানো। দিদিমা মাঝখানের একটি সোফায় বসেছিলেন। বুড়ো মানুষেরও কি গায়ের রঙ আর কি চেহারা! যেন মহারাণী! আর আছেন তিনজন কর্তা, তিন গিন্নি।

ঘরে ঢুকেই তো দিদির ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না। বাবা পিঠে হাত দিয়ে বলল—কান্না নয়, কান্না নয়, আঁচল দিয়ে চোখের জল মোছ আর সেই আঁচলে ওনার পা মুছিয়ে দিয়ে কপাল ঠেকিয়ে প্রণাম করো।

দিদি চকিতে একবার বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে পুনরায় চোখ নামিয়ে তেমনটি করল, দিদিমা মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন, চিবুকে হাত দিয়ে কি সুন্দর হেসে 'আমার নাতবৌটি' বলে আদর করলেন।

—এবার একটা কথা বলি বেয়ান—বাবা বলল—সেদিন আপনার বৌমাকে খুব সাজিয়ে ছিলেন, এক গা গয়না তার ওপর আবার ফুলের গয়না, কত বড় ফুলের মুকুট! আমরা তো বাড়ি গিয়ে বলাবলি করছিলাম অমন ফুলের মুকুট কখনো দেখিনি। তা ওই মুকুট নিয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে গেলে কি করে সামলাবে? তাই ও বলেছিল 'সম্ভব নয়'। কাল আপনাদের এখান থেকে ফিরে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে শেষ পর্যন্ত এই কথা বেরোলো।

দিদি অবাক হয়ে বাবার দিকে তাকিয়েই পরক্ষণে মুখ নীচু করে নিল।— ও মা তাই? দিদিমা বললেন—তাই ভাবি! এমন সুন্দর মেয়ে কেন এমন করবে কেন?

তারপর গলা উঁচু করে ডাকলেন—কোথায় গেলিরে পাগলু যা না ভাই ওপরের ঘরের আলমারি থেকে সাতনরী হারটা নিয়ে আয় ভাই, কোন কাল আগে ওটা গড়িয়ে রেখেছি তোর বউয়ের জন্য!

এতক্ষণে সবায়ের মুখে হাসি ফুটল। ওঃ! বাবা একখানা সাজিয়েছে বটে বুদ্ধি করে। জামাইবাবু হার নিয়ে এল, দিদিমা তাকে দিদির পাশে বসতে বললেন।

সাতনরী হার পরে দিদি সব অপমান ভুলে হাসিমুখে দিদিমাকে আর একবার প্রণাম করে আর সকলকে প্রণাম করে শেষে বাবাকে প্রণাম করল। আহা সাতভরির হার বলে কথা! তাও আবার পুরোনো দিনের! একেবারে খাঁটি সোনা। মায়ের হিসেবে দু-লাখ টাকার ওপর দাম।

আমিও ঠকাঠক সকলকে প্রণাম করে ফেললুম। এবার নিশ্চয় ভালভাল খাবার আসবে! খিদেটা দেখছি বেশ চনচনিয়ে উঠছে। দু'দিন ধরে ভাল খাওয়া হয়নি। এ রকম ঝামেলা থাকলে খিদে পায়!

দিদি বুঝে চলতে শিখেছে। কিন্তু পিসিমণি? একই আছে। এখন শেখাচ্ছে—বাবাকে বলবি, তুমি আমার জীবনটা নষ্ট করে দেবে...

কিন্তু আমি কি এত বুদ্ধু!

যাক্ গল্পটা ভাল করে সাজিয়ে গুছিয়ে লিখে ফেলা যাক্।

নির্যাতিতা

আষাঢ় মাস। আজ দশহরা। জানালায় দাঁড়িয়ে সর্বানন্দ। তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত গঙ্গাবক্ষে। প্রবাহিনী মা গঙ্গা। আজ গঙ্গাপূজা। আকাশে শ্যামল মেঘ সঞ্চার। আকাশ জুড়ে মেঘ যেন মায়ের মতো অবনত—বিশ্বসন্তানকে পান করাতে অমৃতধারা। এওতো মায়ের এক রূপ। একজন ভক্ত তাঁকে গতকাল প্রশ্ন করেছিলেন—এই যে মাতৃপ্রতিমা কালী—এই বর্তমান রূপ ঠিক কবে থেকে পূজিত হচ্ছে? তিনি একটু ভেবে বললেন—মায়ের কি ইতিহাস আছে ভাই! ভক্ত তাঁর মনের ইচ্ছায় প্রতিমার রূপ দেয়। হয়ত কেউ এই রূপ কল্পনা করেছিল, সেটা ক্রমশঃ সকলের মনে ধরেছে। আজ তুমিও তোমার মনের মতো একটি প্রতিমা গড়ে পুজো করতে পার। কোথাও তো একখণ্ড প্রস্তরও মাতৃরূপে পূজিত হয়, বা একটি জলধারা। সেদিন দেখি মন্দিরের পিছনের বাগানে একটি কলার কাঁদি নেমেছে, অবনত কাঁদিটির উপর একটি বড় পাতা নুয়ে আছে ঘোমটার মতো। আবার ছোট মোচাটি কাঁদির মুখে—যেন অলঙ্কার। এত ভাল লাগছে দেখতে! গাছটি যেন মায়ের এক রূপ! আবার দেখ—বিস্তীর্ণ ধানের ক্ষেতে যখন ঢেউ দিয়ে যায় বাতাস—সেও তো মায়ের আরেক রূপ!

গতকাল থেকে মন বড় বিষণ্ণ হয়ে আছে। মাসে একদিন তিনি নাটমন্দিরে ভক্ত সমাগমে আলোচনায় বসেন। বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। সংসারে মানুষ আনন্দের চেয়ে দুঃখকষ্টই পায় বেশি। তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করেন। সব সময় যে সক্ষম হন তা নয়, সে ক্ষেত্রে তিনি জানিয়ে দেন তাঁর অক্ষমতার কথা, আবার কখনও বলেন—ভেবে বলব পরের বার।

তিনি কাউকে তুই বলে সম্বোধন করেন না। তাঁর বয়স পঁয়তাল্লিশ, নিয়ম শৃঙ্খলায় বাঁধা জীবন তাঁর চেহারায় আরো উজ্জ্বলতা দিয়েছে। তাঁকে দেখে সৌম্য সুন্দর যুবক বলেই মনে হয়। তিনি সকলকে 'ভাই' বলে সম্বোধন করেন, বয়স অনুযায়ী তুমি বা আপনি বলেন এবং মহিলাদের সকলকেই মা বলেন।

গতকাল থেকে মন বড় বিষণ্ণ হয়ে আছে। একজন বয়স্ক মানুষ প্রশ্ন করেছিলেন—চারিদিকে এখন এই যে নারী নির্যাতন এ কি বন্ধ হবে না? এর কি কোনো প্রতিকার নেই? এ কি দিনকাল এল?

এসব প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গেলে নিজেকে বড় অশুচি মনে হয়। তাছাড়া এই করুণ প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গেলে বড় ব্যথা লাগে মনে, তবু বলতেই হয়। তিনি বলেছিলেন—চিন্তায় বাধা পড়ল তাঁর—কে ওখানে?

— বাবা, কিছু ফলমূল এনেছি, আজ দশহরা, মন্দিরে দেখলাম কেউ নেই তাই

আপনার ঘরে এলাম, আপনি নিজে হাতে গ্রহণ করলে—জনৈকা বৃদ্ধা, কথা শেষ না করে তিনি তাকিয়ে রইলেন।

—দিন মা, —হাত বাড়িয়ে নিলেন সর্বানন্দ, বৃদ্ধা প্রণাম করলেন।

কেউ প্রণাম করলে সর্বানন্দ সেই প্রণাম মা ভগবতীর উদ্দেশে নিবেদন করে দেন, বলেন—মঙ্গল হোক, মা ভগবতী আপনার মঙ্গল করুন।

সেই ভোরবেলা মঙ্গলারতি থেকে শুরু করে পরবর্তী সমস্ত পূজা সমাপন করেছেন— মাতৃমন্দিরে পূজা, গুরুদেবের মন্দিরে পূজা, ... সব সারা। তিনি স্বপাক ভোজন করেন, যেহেতু আজ দশহরা সুতরাং আজ রন্ধনকার্য নেই। যাই হোক অনেকেই আজ ফলমূলাদি দিয়ে যাবে। তিনি আর কতটুকু আহার করবেন। সমাগত সকলকেই ভাগ করে দেবেন।

কাজ নেই হাতে, তাই ভেবেছেন গ্রন্থ নিয়ে বসবেন—যোগিনী তন্ত্র। অনেক দিন ধরেই ইচ্ছা ছিল পড়ার, কিন্তু বইটি সংগ্রহ করতে পারেননি, সম্প্রতি এক ভক্ত একটি পাঠাগার থেকে অনেক দায়িত্ব নিয়ে নিয়ে বইটি সংগ্রহ করে এনেছে। বেশ জীর্ণ গ্রন্থটির অবস্থা। বইটি বইদানিতে রেখে সাবধানে পাতা ওল্টাতে হবে। ঘরের এককোণে চৌকির ওপর বইদানিতে বইটি রাখা, চৌকির সামনে আসন পাতা, তিনি আসনে বসে বই খুললেন—

যোগিনী : যোগমুক্তা নারী, তপস্বিনী। ভগবতীর অংশসম্ভূতা, সখারূপী সহচরী আবরণ দেবতা।

মৃদু উচ্চারণে তিনি পড়া শুরু করলেন :

নমোহস্তু কালৈ, কামেশ্বর্যৈ নমোহস্তু তে

নমোহস্তু দেবৈ গিরিসম্ভবায়ৈ, নমোহস্তু গৌর্য্যৈ বৃজিনান্তকায়ৈ।

অতীর্থে তীর্থনিষ্ঠেভ্যো ব্যাসদিভ্যো নমো নমঃ।

পৌন্তবিঘ্ন নমস্তেহস্তু নমস্তে কালভৈরব।

নমস্তে দক্ষিণামূর্ত্ত দণ্ডপানে নমোহস্তুতে।

পাঠে বিঘ্ন ঘটল। কে যেন তাঁর পিছন দিয়ে ছুটে চলে গেল ঘরের ওপাশে। ছোটখাট কেউ। তিনি মুখ ফিরিয়ে দেখলেন—ওপাশে ওই আলনার পিছন দিকে কেউ যেন। আলনায় তাঁর দুচারটি গেরুয়া বস্ত্র, তার আড়ালে কেউ যেন, একটু ফাঁক ফোকর দিয়ে দেখা যাচ্ছে লাল রঙের পোশাক। তিনি উঠলেন, এগিয়ে গেলেন। আলনার পিছনে দাঁড়িয়ে এক গৌরী বালিকা, পরনে লাল টুকটুকে জামা। তাঁকে দেখে বালিকা মৃদু হাসল, ঠোঁটে তর্জনী ঠেকিয়ে চুপ করার ভঙ্গী করল। কত বয়স হবে—বছর আট নয়—কি সরল হাসিমুখ তার।

বাইরে শিশুদের কলরব শোনা যাচ্ছে। সামনেই গঙ্গার ঘাট। আজ মন্দিরের ঘাটে অনেক স্নানার্থী। অন্যদিন এত মানুষ আসেন না। আজ দশহরা গঙ্গাপূজা—এজন্য এত মানুষের সমাগম। তাদের সঙ্গে ছোটরাও এসেছে, ছুটোছুটি করে খেলা করছে।

—কেউ আসেনি তো? —ফিস্‌ফিস্ করে বলল মেয়েটি।

—কই না তো? —দরজার দিকে দেখে তিনি বললেন।

— কেউ এলে বোলো না আমি লুকিয়েছি। কাকলির সঙ্গে বাজি ধরেছি, আমাকে খুঁজে না পেলে ও একটা ক্যাডবেরি খাওয়াবে।

—আর খুঁজে পেলে তুমি ওকে খাওয়াবে—তাই তো? —তিনি বললেন।

—তাই। —বলল বালিকা।

দেখ কাণ্ড! তিনি মনে মনে ভাবলেন—সকালবেলা আজ গৌরী মা এসে লুকোলেন আমার ঘরে। কখন এলেন? যখন আমি যোগিনীতন্ত্র পড়তে বসেছি—মাতৃপ্রণাম, মহর্ষি প্রণাম, গণপতি প্রণাম, দণ্ডপাণি কালভৈরব প্রণাম—নমহস্তু গৌর্য্যৈ বৃজিনান্তকায়ৈ—

— এগুলো তোমার জামাকাপড়? — গেরুয়া বসনগুলি নাড়তে নাড়তে বলল বালিকা, গন্ধ নিল—কি সুন্দর গন্ধ! —বলল —চন্দনের গন্ধ, তাই না?

—হ্যাঁ। —বললেন তিনি।

— তোমার গায়েও খুব সুন্দর গন্ধ—চন্দনের—খুব কাছে এসে বলল, তাঁর গায়ে নাসিকার স্পর্শ।

অবোধ বালিকা। তিনি একটু সরে গেলেন।

—তুমি দেখতেও খুব সুন্দর—বলল বালিকা।

— তুমি আরও সুন্দর, হে গিরিসম্ভাবায়ে পার্ব্বতি! তুমি অপরূপা! নমহস্তু, নমহস্তু, নমহস্তু তে!

—তুমি আমার সঙ্গে খেলবে?

—হ্যাঁ খেলব।

বালিকা দুহাত দিয়ে সহসা জড়িয়ে ধরল তাঁর কটিদেশ।

একি? বালিকার হাত খেলতে চাইছে একি খেলা? তাঁর শরীরে সংশ্লিষ্ট হয়ে—এ কি?

তাঁর সারা শরীরে সহস্র বৃশ্চিকের দংশন। দুহাতে ঝেড়ে ফেলতে চান বৃশ্চিকগুলি। সরিয়ে দেন বালিকার হাত ঠেলে দেন তফাতে।

অবাক বালিকা সন্ত্রস্ত।

কয়েক মুহূর্ত—তিনি নিজেকে সংযত করেন, বালিকার মাথায় হাত বুলিয়ে দেন সস্নেহে, প্রশ্ন করেন— এ খেলা তোমায় কে শিখিয়েছে?

বালিকা ফিস্‌ফিসিয়ে উত্তর দেয়। শুনে তিনি হতবাক!

গতকাল থেকে তাঁর মন বড় বিষণ্ণ হয়ে আছে। সেই যে প্রশ্নকর্তা প্রশ্ন করলেন—নারী নির্যাতনের কথা—এ কি দিনকাল এলো?

এসব প্রসঙ্গ আলোচনা করতে বড় ঘৃণা হয়, যন্ত্রণা হয়, কিন্তু বাস্তবকে অস্বীকার করলে তো চলবে না। তাই চুপচাপ মাথা নীচু করে দুমিনিট বসেছিলেন তিনি, তারপর—

এ তো শুধু একালের কথা নয় দাদাভাই—প্রৌঢ় বয়স্ক প্রশ্নকর্তাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন তিনি—এ আদিকাল থেকে চলে আসছে। সেই রামায়ণের কথাই ধর, এক বীর বলশালী পুরুষ—রাবণ রাজা—ছলে বলে কৌশলে সীতাকে হরণ করে নিয়ে গেলেন। এক অসহায় নারী, কতটুকুই বা তাঁর শরীরে শক্তি। এখনকার ভাষায় হরণ না বলে তুলে নিয়ে গেলেন। আবার দেখ, রামায়ণের শেষ পর্বে—দীর্ঘকাল বন্দিনীর জীবনে কত দুঃখ কষ্ট লাঞ্ছনার মধ্যে দিয়ে দীর্ঘদিন কাটিয়ে তিনি যখন ভাবছেন জীবনে সুখের মুখ দেখবেন—তখন প্রজারা তাঁর চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করতে চাইছে, এবং তাঁর স্বামীও তাঁকে অগ্নিপরীক্ষার মুখে ঠেলে দিচ্ছেন। কি অপমান! কি লাঞ্ছনা!

তিনি দুহাত জোড় করে কপালে ঠেকালেন, বললেন—হে রাম। তুমি দয়াময়, আমি কতটুকু বুঝি তোমার লীলা। আমাকে ক্ষমা কর প্রভু।

নাটমন্দিরে সমবেত নারী পুরুষ নির্বাক।

— আবার মহাভারত দেখ—মেনকা—স্বর্গের এক অপ্সরা—স্বর্গরাজের আদেশে তাঁকে যেতে হলো বিশ্বামিত্রের ধ্যান ভঙ্গ করতে। এক নারী—তাঁর নিজের সম্মান সম্মতি ইচ্ছা অনিচ্ছা—এসব কিছু নয়, দেবতাদের স্বার্থরক্ষার জন্য রাজার আদেশে তাঁকে বিশ্বামিত্রের চরিত্র হানি করতে হলো, সন্তান ধারণ করতে হলো। কিন্তু এই সন্তানকে নিয়ে তিনি কি করবেন? বিশ্বামিত্রকে কন্যাসন্তানটি সমর্পণ করে তিনি ফিরে গেলেন। আর দেখ, বিশ্বামিত্র জ্ঞানী পুরুষ। পিতার কর্তব্য কণামাত্র পালন না করে সেই অসহায় শিশুকন্যাকে পথপার্শ্বে ফেলে দিয়ে চলে গেলেন তপস্যায় বসতে। এ তো মৃত্যুর হাতে সঁপে দেওয়া।

সর্বানন্দ আবার দুহাত জড়ো করে কপালে ঠেকালেন, বললেন—হে মহাঋষি, আমি আপনার পদাঙ্গুলির কণামাত্র নেই, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। —এরপর দেখ আর এক দয়ালু মুনি সেই শিশুকে তুলে নিয়ে গিয়ে প্রতিপালন করলেন, তাঁকে শতকোটি প্রণাম। আশ্রমে সেই রাজকন্যা তাপসীর মতো প্রতিপালিত হলেন।

শকুন্তলা, অপরূপা শকুন্তলা যৌবনে উপনীত। সমাজ সংসার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, যৌবন কি, বিবাহ কি কিছুই জানেন না। কিন্তু এক অভিজ্ঞ পুরুষ দুষ্মন্ত—বলশালী মহান রাজা, তিনি বনদেবীর মতো শকুন্তলাকে দেখে মুগ্ধ হলেন এবং ভেগের তাড়নায় সকলের অগোচরে নামমাত্র বিবাহ অনুষ্ঠান করে ভোগবাসনা পূর্ণ করতে চাইলেন। শকুন্তলা বাধা দিচ্ছেন কিন্তু দুষ্মন্ত কালক্ষেপ করতে চাইছেন না। তখন শকুন্তলা রাজাকে প্রতিজ্ঞা করাচ্ছেন— আমার পুত্রকে কিন্তু রাজা করতে হবে। দুষ্মন্ত সবেতেই রাজি হয়ে যাচ্ছেন, যেভাবে হোকভোগ করতে হবে। এবং মনোবাসনা পূর্ণ করে নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে শীঘ্রই শকুন্তলাকে রাজধানীকে নিয়ে যাবেন বলে প্রস্থান করলেন এবং কৃতকর্ম প্রতিশ্রুতি সব ধুয়ে মুছে ফেললেন। একটু আত্মগ্লানিও অনুভব করলেন না।

প্রশ্নকর্তা এসময় কিছু বলতে চেষ্টা করলেন—কিন্তু মহারাজ—সর্বানন্দ তাঁকে হাত তুলে নিবৃত্ত করলেন, বললেন—আমি জানি আপনি কি বলবেন, আমার কথা শেষ হলে আপনিই উত্তর পেয়ে যাবেন।

একটু চুপ করে থেকে পুনরায় বক্তব্য শুরু করলেন সর্বানন্দ। নিস্তব্ধ নাটমন্দির, নিশ্চুপ সমবেত মানুষজন।

— কতদিন গেল, কত মাস, সমর্পিত প্রাণ শকুন্তলা সামান্য সেই সুখস্মৃতি সম্বল করে পুত্র সন্তানের জন্ম দিলেন। কেটে গেল ছ-বছর। অসহায় কণ্বমুনি দুই ঋষিকুমারকে সঙ্গে দিয়ে সপুত্র শকুন্তলাকে রাজধানীতে মহারাজ দুষ্মন্তের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন।

আবারও সর্বানন্দ চুপ করে রইলেন, তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো—বললেন—সেই করুণ দৃশ্যের কথা আমি কি করে বলব! সেই রাজসভা, মহারাজ দুষ্মন্ত আসীন সিংহাসনে, সভাগৃহে নানা গুণী মানুষ, বীর যোদ্ধা, জ্ঞানী মন্ত্রীরা উপস্থিত—সেই সভামধ্যে বালকপুত্রের হাত ধরে দাঁড়িয়ে অতি সাধারণ পোশাক পরিহিতা তাপসী শকুন্তলা। ঋষিকুমারেরা তাঁর পরিচয় দিয়ে বললেন—মহর্ষি কণ্ব পাঠিয়েছেন আপনার স্ত্রী পুত্রকে গ্রহণ করুন। একথা বলে ঋষিকুমারেরা প্রস্থান করলেন।

রাজা কি করছেন? সোজাসুজি অস্বীকার করছেন। শুধু অস্বীকার করছেন না,

সেই সাধ্বী নারীকে ব্যাভিচারিণী, দুশ্চরিত্রা এসবও বলছেন, রাজাকে প্রতারিত করতে চাইছেন—এইসব বলে তাঁকে তাড়িয়ে দিতে চাইছেন।

—দৃশ্যটি চিন্তা করুন—বলতে বলতে সর্বানন্দ কেঁদে ফেললেন—সেই বিশাল রাজসভার মধ্যে সন্তানের হাত ধরে দাঁড়িয়ে অসহায় এক নারী কাকুতি মিনতি করছেন কিন্তু দুষ্মন্ত তাঁকে আরও কটুবাক্য বলছেন।

রাজসভায় সমবেত বিশিষ্ট শত পুরুষ, মধ্যে একা নারী শকুন্তলা, নির্লজ্জের মতো রাজাকে স্মরণ করাতে চাইছেন সেই ভালোবাসার কথা, বিবাহের কথা, কিন্তু দুষ্মন্ত নির্বিকার, বরং রুষ্ট।

শকুন্তলার এই অধ্যায় পড়তে বড় কষ্ট হয়। তাঁর কাকুতি মিনতি তাঁর শাস্ত্র বিশ্লেষণ— পুত্রসন্তান কি— তার বর্ণনা, স্ত্রীকে অস্বীকার করলে তার পাপ—এসব বোঝাচ্ছেন। শকুন্তলা বিদুষী, কণ্বমুনির আশ্রয়ে শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন—কিন্তু রাজা দুষ্মন্ত আরও কটুবাক্য প্রয়োগ করছেন—অশালীন কথায় বিদ্ধ করছেন। তখন শকুন্তলা রুষ্ট, ক্ষোভে ফেটে পড়ছেন। তিনি জানেন তাঁর জন্মপরিচয়। কণ্বমুনি ধ্যানযোগে জেনেছিলেন শকুন্তলার জন্মপরিচয় এবং একদিন কণ্বমুনি আরেক ঋষিকে যখন সেই জন্মপরিচয়ের কথা বলছিলেন শকুন্তলা আড়াল থেকে শুনেছিলেন—এখন রোষের সঙ্গে বলছেন জানো রাজা আমার পিতা কে? রাজর্ষি বিশ্বামিত্র, আর মাতা স্বর্গের অপ্সরা মেনকা। শুনে দুষ্মন্ত আরও বিদ্রুপ করছেন, বলছেন বাঃ! তোমার পিতা একজন নীচাশয় অসংযমী পুরুষ যিনি এক নারীর ছলনায় তপস্যালব্ধ শক্তি বিসর্জন দিয়েছিলেন, আর তোমার মাতা স্বর্গের এক সুনিকৃষ্টা স্বৈরিণী। এই তো তোমার জন্মপরিচয়। তুমি আর কত ভালো হবে। কার না কার সন্তান নিয়ে আমাকে প্রতারিত করতে এসেছ।

উঃ! ভাবতে গেলে কষ্ট হয় এক বলশালী মহারাজা সবকিছু জেনেবুঝে নিজের চরিত্রে কলঙ্ক লাগবার ভয়ে এক অসহায় নারী—যাকে তিনি গোপনে বিবাহ করেছেন তাঁর প্রতি এমন নিকৃষ্ট ব্যবহার করছেন।

আবারও প্রশ্নকর্তা কিছু বলতে চাইলেন—কিন্তু মহারাজ—তিনি হাত তুলে নিবৃত্ত করলেন, বললেন—জানি তুমি কি বলবে। মহাকবি কালিদাস রচিত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' কাব্যে আছে দুষ্মন্ত চলে যাবার পর বিরহকাতর শকুন্তলা স্বামীর চিন্তায় বিভোর হয়ে বসে আছেন। দুর্বাশা মুনি এসে অনেক ডাকাডাকিতেও তাঁর হুঁশ নেই, দুর্বাশা রেগে অভিশাপ দিলেন—যার চিন্তায় তুমি বিভোর সে তোমাকে বিস্মৃত হবে। কিন্তু শকুন্তলা অভিশাপও শোনেন না। ছুটে এলেন আরেক আশ্রমবালিকা অনুসূয়া,

পায়ে ধরে কাকুতি মিনতি করলেন, তখন দুর্বাশার রাগ প্রশমিত হলো, তিনি বললেন, রাজার দেওয়া কোনো অভিজ্ঞান দেখাবেন তাহলে পুনরায় সবকিছু স্মরণে আসবে।

রাজা শকুন্তলাকে একটি অঙ্গুরীয় দিয়েছিলেন। তাই ঠিক হলো শকুন্তলা রাজাকে ওটা দেখাবেন তাহলে তাঁর সব মনে পড়বে। কিন্তু রাজধানীতে যাবার কালে দীর্ঘ পথিমধ্যে এক সরোবরে স্নান করার সময় অঙ্গুরীয় খুলে পড়ে যায়। রাজসভা মধ্যে শকুন্তলা যখন আঁচলে বাঁধা অঙ্গুরীয় দেখাতে যান, দেখেন অঙ্গুরীয় নেই। অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করার পর শকুন্তলা আশা করে অঙ্গুরীয় দেখাতে গেলেন কিন্তু পারলেন না, তখন রাজা তাঁকে আরও উপহাস করলেন। তখন শকুন্তলা করুণ স্বরে মাকে ডাকতে লাগলেন, মেনকা স্বর্গ থেকে এসে সপুত্র শকুন্তলাকে নিয়ে চলে গেলেন।

পরে এক মৎসজীবির জালে পড়া মাছের পেটে পাওয়া গেল অঙ্গুরীয়, কানাকানিতে খবর পৌঁছাল কোতোয়ালের কাছে, কোতোয়াল মৎসজীবিকে বন্দী করে আনলেন চোর বলে। রাজার কাছে বিচার করতে এলে অঙ্গুরীয় দেখে রাজার সবকিছু স্মরণ হলো, তখন তিনি হা শকুন্তলে বলে রোদন করতে লাগলেন। পরে স্ত্রী পুত্রের সঙ্গে তাঁর মিলন হয়।

কিন্তু এ কাহিনীতে কালিদাস মহাভারতের কাহিনীর সঙ্গে কল্পনার রঙ চড়িয়ে কাব্য করেছেন। মহাভারতে এসব নেই। সেখানে রাজা সব জেনে বুঝে নিজের চরিত্রের কলঙ্ক ঢাকবার জন্য মিথ্যাচার করেছেন, এবং যৎপরোনাস্তি শকুন্তলাকে লাঞ্ছনা অবমাননা করেছেন।

এবার চলে যাই মহাভারতের আরেক পর্বে—দ্রৌপদী—এ কাহিনী সবার জানা। দ্রৌপদী! অযোনিসম্ভূতা নারী! যজ্ঞের অগ্নি থেকে তাঁর জন্ম, তিনি যাজ্ঞসেনী। সেই নারী—তাঁর জীবনের গ্লানির কথা—তিনি ভালোবেসেছিলেন অর্জুনকে কিন্তু নিজেকে সমর্পণ করতে হয়েছিল পঞ্চপুরুষের কাছে প্রেমহীন ভালোবাসাহীন ইচ্ছাহীন শুধুমাত্র দেহ। এরপর সেই ভয়ানক দৃশ্য, সেই রাজসভা—সভামধ্যে আসীন তদানীন্তন ভারতের সব জ্ঞানী, গুণী মহাজন, বীরপুরুষেরা তার মধ্যে লাঞ্ছিতা একাকিনী রজস্বলা সামান্য বস্ত্র পরিহিতা নারী—সব লাঞ্ছনা সহ্য করতে হচ্ছে স্বামীর অবিমিশ্রকারিতায়। তাঁর কেশ আকর্ষণ করে টানতে টানতে নিয়ে আসছে এক দুর্জন পুরুষ, তিনি সকলের কাছে কাকুতি মিনতি করছেন কিন্তু সকলে নির্বাক। সেই সমবেত পুরুষের দল দেখছেন সেই নির্যাতন। উঃ! —কথা থামিয়ে কাতর শব্দ করলেন সর্বানন্দ।

সমবেত মানুষজনের মধ্যে গুঞ্জন, জনৈকা বৃদ্ধা বললেন—থাক না বাবা এসব কথা, আপনার কষ্ট হচ্ছে।

—না, মা, কষ্ট হলেও অস্বীকার তো করতে পারি না এই নির্যাতন। আর এর প্রতিকার কি হয়েছে? প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে মহাকাব্য রচয়িতা কবিরা দৈবের আশ্রয় নিয়েছেন। মা সীতার করুণ কান্নায় ধরিত্রী মাতা বিদীর্ণ হয়েছে, মাতা তাঁকে গ্রহণ করেছেন। শকুন্তলার ক্ষেত্রে দৈববাণী হয়েছে—রাজা, শকুন্তলা তোমার স্ত্রী, তাঁর পুত্র তোমার ঔরসজাত, তাদের গ্রহণ করো, এবং দ্রৌপদীর ক্ষেত্রে দ্রৌপদীর আকুল প্রার্থনায় এসেছেন ভগবান কৃষ্ণ, তিনি অফুরান বস্ত্র জুগিয়ে দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করেছেন।

সমগ্র নাটমন্দির নিস্তব্ধ। একজন মহিলা মৃদুস্বরে বললেন—তাহলে এ যুগেও কি নারী নিজের সম্মান নিজের জীবন ওই দৈবের হাতে সঁপে দিয়ে অসহায় জীবন কাটাবে বাবা?

—জানি না মা, আমি জানি না—অসহায় কণ্ঠে বললেন সর্বানন্দ। আরও আছে— রাজা মাহারাজা নবাব বাদশা জমিদারের অত্যাচারের কথা। কত সহস্র অত্যাচারিত নারীর অশ্রুজলে সিক্ত এই দেশের ভূমি। এইসব দুশ্চরিত্র পশুর হাঁড়িকাঠে বলি হয়েছে কত অসহায় নারীর প্রাণ!

আসন ছেড়ে উঠে পড়েছিলেন সর্বানন্দ, মন্দিরে প্রবেশ করে সাষ্টাঙ্গ প্রণামে পড়ে ছিলেন কতক্ষণ।

সর্বানন্দ ব্রহ্মচারী। নারী স্পর্শ থেকে তাঁর জীবন দূরে। এমনকি মাকেও তিনি দেখেননি। জ্ঞান হওয়া থেকে তিনি গুরুদেবকেই বাবা বলে ডেকেছেন। সাধক তিনি, তাঁরই গড়া এই মন্দির এবং তৎসংলগ্ন যা কিছু। তাঁর মৃত্যুর পর সর্বানন্দ গুরুদেবের মন্দির গড়েছেন ও মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন।

কোথা থেকে তাঁকে শিশু অবস্থায় এনেছিলেন তা গুরুদেব কখনো জানাননি। উচ্চ বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করার পর তাঁকে দীক্ষা দিয়েছিলেন। বাল্যকালে একদিন মায়ের কথা জিজ্ঞাসা করলে হাত ধরে মন্দিরে নিয়ে গিয়ে বলেছিলেন—এই তোমার মা। এবং তখন থেকেই পূজার্চনা সেবাকার্য কিছু কিছু করে শেখাতে শুরু করেন। সংস্কৃত আলাদা করে নিজে পড়াতেন। শাস্ত্র সম্পর্কীয় পাঠ তাঁরই কাছে। এভাবে তাঁকে তৈরি করেছেন এবং বুঝিয়েছেন—সংসার তাঁর জন্য নয়। বলেছেন—তুমি মায়ের সেবক, সাথে সাথে সংসারের মানুষদেরও সেবক। তাঁদের দীক্ষা দেবে, সুখ দুঃখের কথা শুনবে, যথাসাধ্য চেষ্টা করবে মঙ্গল করার। তবে কখনও কাউকে ভুল

বুঝিয়ে নিজের বা মন্দিরের জন্য অর্থ সংগ্রহ করবে না। সাধুর জীবন গ্রহণ করেছ, সততাই তোমার মূল ধর্ম। সেভাবেই গুরুদেবের প্রদর্শিত পথে জীবনযাপন করেন সর্বানন্দ।

যে বিষণ্ণতা নিয়ে আজ দিন শুরু হয়েছিল তা এখন জ্বলন্ত অগ্নি। তাঁর শরীর জ্বলে যাচ্ছে। এই বালিকার সম্মুখে তিনি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছেন না। তিনি যেন সমগ্র পুরুষ জাতির প্রতিভূ। এই সরলমতি বালিকাকে তিনি কি বলবেন?

সর্বানন্দ নতজানু হলেন বালিকার সম্মুখে, হাত জোড় করে বললেন—মা গৌরী, এ খেলাটা ছোটদের খেলতে নেই, যে তোমাকে শিখিয়েছে সে খুব খারাপ কাজ করেছে, এতে পাপ হয়, মা কালী রাগ করেন। এসো আমরা মায়ের কাছে প্রার্থনা করে বলি, যাতে তিনি এবারের মতো তোমাকে মাফ করে দেন।

তিনি বালিকার হাত ধরে পাঠস্থানে এলেন, যোগিনী তন্ত্র বই সরিয়ে রেখে চৌকির উপর তাকে বসতে বললেন। বালিকা কিছুটা ভীতভাবে আদেশ পালন করল। সর্বানন্দ ভক্তিমতী বৃদ্ধার রেখে যাওয়া পূজার উপাদান থেকে একটি সন্দেশ ও পদ্মফুলটি নিয়ে বালিকার বাঁ হাতে পদ্ম ও ডান হাতে সন্দেশটি দিলেন, তারপর নিজ আসনে বসলেন পদ্মাসন হয়ে, জোড় হস্তে উচ্চারণ করলেন—

নমোহস্তু কালৈ, কামেশ্বর্যৈ নমোহস্তু তে

নমোহস্তু দেবৈ গিরিসম্ভবায়ৈ, নমোহস্তু গৌর্য্যৈ বৃজিনান্তকায়ৈ।

ওঁ সর্বমঙ্গলং মাঙ্গল্যে শিবে সর্বার্ত সাধিকে।

স্মরণ্যে ত্রম্বকে গৌরী নারায়ণী নমোহস্তুতে।।

তিনি চোখ বুঝে মন্ত্রোচ্চারণ করছিলেন, পিছনে দরজার কাছে কাদের কলরব—নারী কণ্ঠ ও পুরুষ কণ্ঠ—ফিরে দেখলেন—মধ্যবয়স্কা নারী এক, বলছেন—ওই তো জয়ন্তী।

ওনারা কাছে এলেন, মধ্যবয়স্ক পুরুষটি বললেন—এ কি করছেন আপনি? — তাঁর কণ্ঠস্বর রুক্ষ।

সর্বানন্দ উঠে দাঁড়ালেন, এই সেই পুরুষ গতকাল যিনি প্রশ্ন করেছিলেন নারী নির্যাতন নিয়ে—

—এরা তোমার কে হয়? —বালিকাকে প্রশ্ন করলেন সর্বানন্দ।

—ঠাকুমা ও দাদু—বলল বালিকা। — জ্বলন্ত দৃষ্টিতে প্রৌঢ়ের দিকে তাকালেন সর্বানন্দ, বললেন—ওকে এক দুর্জন পাপী নষ্ট করতে চাইছে, তাই বাঁধন দিয়ে দিলাম, মা ওকে রক্ষা করবেন। আপনার মা জীবিত না গত?

–গত–ভীত প্রৌঢ় মুখ নীচু করলেন।

–এখন থেকে একে মা বলে ডাকবেন।

বালিকাকে হাত ধরে তুললেন সর্বানন্দ, বললেন–ওই সন্দেশটা ভেঙে একটু মুখে দাও মা তারপর আমাদের একটু করে ভেঙে প্রসাদ দাও।

বালিকা তাই করল। ওরা বাধ্য অনুগতভাবে প্রসাদ খেলেন।

–পদ্মফুলটা তুমি নিয়ে যাও মা, একেকটা পাপড়ি ছিঁড়ে ছিঁড়ে তোমার বইগুলির মধ্যে রেখে দেবে।

–যাও, ওকে নিয়ে যাও–হাত জোড় করে কপালে ঠেকালেন, মৃদু স্বরে উচ্চারণ করলেন–জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনি...

ওরা চলে যাচ্ছে–দেখতে দেখতে অস্ফুষ্ট বললেন–যাও মা, জীবনে দীর্ঘপথ তোমাকে চলতে হবে অসহায় হয়ে। মহাভারতের এই বিশাল সভায় অনেক ভক্ষক আর সবাই দর্শক, কেউ রক্ষাকর্তা নেই। মা তোমাকে রক্ষা করুন আর শক্তি দিন যাতে তুমি নিজেই নিজেকে রক্ষা করতে পারো।

হ্যালো কৃষ্ণ

হ্যালো কিষ্ণ, হ্যালো কিষ্ণ, কিষ্ণ কিষ্ণ হ্যালো হ্যালো – সকাল বেলা চিন্টু বকর বকর করহৈ চলেছে। বারান্দায় লাফাতে লাফাতে এমাথা থেকে ওমাথা যাচ্ছে আর আসছে, আর একই লাইন বার বার বকে চলেছে। ঠাকুমা ছাদের ঘর থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে দেখলেন আর শুনলেন, বললেন – ও ভাই, ওটা কি বলছ?

– কেন? তুমি তো রোজই সকালে ডাকো, আমিও ডাকছি।

– কেন ডাকছ?

– কেন আবার এমনি এমনি।

– কিন্তু বলাটা তো ঠিক হচ্ছে না, হবে – হরে কৃষ্ণ।

– তুমিই জানোনা, কাউকে ডাকতে গেলে হ্যালো বলতে হয়, – হ্যালো ম্যাম, তেমনি – হ্যালো কিষ্ণ! ফোন করার সময় বলো না? হরে আবার কি? কি মানে?

আট বছরের নাতির অকাট্য যুক্তি নিয়ে হিমসিম ঠাকুমা উমারানী, কি বোঝাবেন, বললেন – ও তো মন্ত্র, মন্ত্রের আবার মানে কি! তাছাড়া হ্যালো তো ইংরাজি কথা।

অতঃপর উমারানী সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ভাবতে লাগলেন, সত্যিই তো হরে মানে কি? গুরুদেব সেই যে বলেছিলেন হরিনাম করতে, বলেছিলেন হরিনাম সারাক্ষণ জপ করতে পার মা, বিশেষতঃ মন যখন চঞ্চল হবে, অস্থির হবে, ক্ষোভে দুঃখে কাতর হবে তখন আরো বেশি করে হরিনাম জপ করবে, দেখবে মন কেমন ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে যাবে। তা মন তো তাঁর সারাক্ষণই নানান চিন্তায় অস্থির। আশি পেরিয়ে নব্বই এর দিকে এগিয়ে চলেছেন। কবে আছেন কবে নেই, তবু বৈষয়িক চিন্তা থেকে মুক্তি পেলেন কই। কিন্তু এ কি কথা নাতি শুনিয়ে দিল? এত দিন হরিনাম করেছেন তার মধ্যে হরি কোথায়? হর মানে শিব আর হরি হচ্ছেন নারায়ণ তার মধ্যে হরে – দুশ্চিন্তায় অস্থির উমারানী আরো ঘনঘন হরিনামে মগ্ন হলেন।

এমনিতেই তিনি খুব দুশ্চিন্তায় মগ্ন আছেন। মুম্বাই থেকে মেজ ছেলে কাল রাতে বেশ কড়া মেজাজেই কথা বলল – কতদিন থেকে তোমাকে বলছি তুমি থাকতে থাকতে বাড়িটা ভাগাভাগির বন্দোবস্ত করো, নাকি নরম গলায় শুনতে পাচ্ছ না? শুনে তাঁর মেজাজ চড়ে গেল – অত মেজাজ দেখাচ্ছিস কেন? তোর খাই না পরি? এখন বুঝছি বাড়ি কেন তিনি আমার নামে করে গেছেন। তোদের তো অনেক খরচপাতি করে মানুষ করে গেছেন, অনেক রোজগার করছিস, মাকে কিছু দিস? আমার বাড়ি আমি কিছু করব না যাঃ, মরে গেলে সবাই মিলে শকুনের মতো ছিঁড়েখুঁড়ে খাস।

বড় ছেলে আছে দিল্লিতে, ভালই বাড়ি করেছে, কলকাতায় আর ফিরবেও না,

তা সে কিছু না বলে বৌকে দিয়ে বলায় – মা, তোমার নাতনিটার বিয়ের কথা কিছু ভাবছ ? যতই এখন মেয়েরা গয়না না পরুক বিয়ের সময় কিন্তু গা ভরে গয়না দিতেই হবে, আর সোনার দাম কোথায় পৌঁছেচে ! কিনে দেবার সাধ্যি কি ! তুমিই ভরসা মা !

তা বড় বৌ এমন মিনমিন করে বলে যে তাকে তিনি মেজাজ দেখিয়ে কিছু বলতে পারেন না।

মেয়ের বাড়ি মালদা, তার ছেলেটি ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছে, কলকাতায় চাকরি নিয়ে আসতে চায়, মেয়ে চাইছে বাড়ি ভাগ করে তাকে একটা অংশ দেওয়া হোক, সে আলাদা করে সব সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়ে বসবাস করবে।

এবার রইল ছোট ছেলে। এ ছেলে তাঁর অনেক বয়সের ছেলে, তা সে ছেলের বয়স এখন চল্লিশ হয়ে গেল। তার এক মেয়ে বারো বছরে পড়ল, আর ছেলেটি আট, এদের নিয়েই তাঁর সুখ দুঃখের সংসার। ছোট বৌয়ের বাবা বছর চারেক হল গত হয়েছেন, মা একা, সে বাড়ি বেশ ছিমছাম পরিবেশে সুন্দর বাড়ি। মুখে না বললেও ছোট বৌয়ের এমন ভাব যেন উত্তর কলকাতার এই বাড়ি ছেড়ে ইচ্ছে করলেই চলে যেতে পারি দক্ষিণ কলকাতায় মায়ের কাছে, মাকে একটু যত্ন করতে পারি ! অবশ্য ছেলে তাঁর শান্তশিষ্ট অল্প কথার মানুষ হলেও যেটা বলে সেটা বেশ দৃঢ় ভাবেই বলে। সেও ভাবে বুঝিয়ে দেয় শ্বশুরবাড়ি গিয়ে ওঠা অসম্ভব।

কিন্তু উমারানী বোঝেন সংসারে অসম্ভব বলে কিছু নেই। আজ যদি তিনি বাড়ির ভাগ ছোট ছেলেকে না দেন, সে কি ভাড়া বাড়ি খুঁজবে ? তবে ছোট ছেলেও লড়ে আছে মায়ের খুঁটির জোরে, জানে মা তাঁকে বঞ্চিত করতে পারবে না।

মেজাজটা কাল রাত থেকে খিঁচিয়ে ছিল উমারানীর, সকালে তার প্রভাব পড়েছিল পুজোয় বসে। যতই মন স্থির করে জপ করতে চেয়েছেন মনে ঠিক ঢুকে পড়েছে মেজ ছেলের মেজাজ। কিন্তু নাতির এই হরিনাম ব্যাখ্যা নিয়ে মন সব ওলটপালট ! এতদিন ধরে জপ করছেন যে মন্ত্র তার অর্থই জানা নেই ! গুরুদেবও দেহ রেখেছেন, নাহলে তাঁকেই জিজ্ঞাসা করতেন।

প্রতি বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীপুজো করতে আসেন পুরোহিত মশাই, তাঁকেই জিজ্ঞাসা করলন। – একথা তো আমার জানা নেই মা – ঠাকুরমশাই বললেন – মহাপ্রভুর দেওয়া নাম, হরিনাম মন্ত্র, ওই ষোলো শব্দের মধ্যে গাঁথা আছে যে মহামন্ত্র তার ব্যাখ্যা কে দেবে ! মহাপ্রভু বলেছেন – ‘নাম ভজ নাম চিন্ত নাম কর সার’ ! নামের মহিমা অপার, ব্যাখ্যা করে কি তা বোঝা যায় মা !

উমারানী শুনলেন, কিন্তু মন ভরল না।

সারাদিন ধরে মন বিষণ্ণ তাঁর। যে নাম জপ করে এতদিন চললেন, কি নাম, কার নাম না বুঝেই, তার ফল কি? ভাবলেন ছেলেদের জিজ্ঞাসা করবেন।

চিন্ময়, মৃন্ময় আর তন্ময়, তিন ছেলে, কেউ কি বলতে পারবে না? সন্ধ্যায় তন্ময় ছেলেকে নিয়ে পড়াতে বসে, জপ সেরে গুটিগুটি তার কাছেই এলেন, বললেন – তনু, একটা কথার মানে জিজ্ঞাসা করার ছিল।

অঙ্কের খাতা থেকে মুখ তুলে চাইল তন্ময়।

– হরে কৃষ্ণ কথাটার হরে কথাটার মানে কি?

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে তন্ময় বলল – মন্ত্রের মানে কি ঠিকঠাক বলা যায় মা! ওঁ মানে কি? এর হাজার ব্যাখ্যা। হ্রিং! – এ মন্ত্রের অর্থ কি?

– কিন্তু একটা ব্যাখ্যা তো পাওয়া যাবে?

– আমার জানা নেই মা। – বলে ছেলেকে অঙ্ক বোঝাতে লেগে গেল।

– তোমার পড়া হয়ে গেলে আমায় একটা নম্বর ধরে দিওতো বাবু – নাতিকে উদ্দেশ্য করে বললেন উমা। তাঁর একটা স্মার্টফোন আছে, একটা খাতায় সব নাম নম্বর লেখা আছে, ফোন করেন, গান শোনেন, পুরোনো দিনের সিনেমা দেখেন, কিন্তু সবই নাতি ধরে করে দেয়।

রাতে নাতিকে বললেন, বড় জেঠু চিন্ময়কে দাও।

– হ্যালো চিনু? কি করছিস?

– কিছু না, এমনি শুয়ে আছি।

– শরীর ভাল তো?

– হ্যাঁ মা।

– খাওয়া হয়েছে?

– না, একটু পরে খাব।

– হ্যাঁরে, দীক্ষাটিক্ষা নিয়েছিস?

– হঠাৎ এ কথা?

– না, বয়স হচ্ছে তো!

– তোমার বৌমা দীক্ষা নিয়েছে।

– তুইও নিয়ে নে। আচ্ছা, একটা কথার মানে বলতে পারবি? এই যে হরে কৃষ্ণ নাম, এর হরে কথাটার মানে কি?

– ভারি মুশকিলে ফেললেতো! এ আমি কি করে বলব? এসব ধর্মকর্ম নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না।

— বৌমা বলতে পারবে ?

— ধরো, ওকে ডেকে দিচ্ছি।

— হ্যাঁ, মা বলুন। — বৌমার গলা।

— একটা খুব ধন্দে পড়েছি মা, তুমি তো দীক্ষা নিয়েছ, হরে কৃষ্ণ নামের হরে শব্দের অর্থ জানো ?

— আমি তো কালীবাড়িতে দীক্ষা নিয়েছি মা, কৃষ্ণ মন্ত্রের কিছুই জানিনা।

— ও ! আচ্ছা তোমার মেয়ে তো অনেক পড়াশোনা করেছে, ওকে জিজ্ঞাসা করতো !

বড় বৌমা হেসেই অস্থির, কি যে বলেন মা ! আচ্ছা আমি ওকে ডেকে দিচ্ছি, ধরুন।

— কেমন আছ ঠাকুমা ? এখনো ঘুমাওনি ?

— আর দিদি ঘুম ! এই বয়সে ঘুম কি অত সহজে আসে ! যাকগে একটা ধন্দে পড়েছি, হরে কৃষ্ণ নামে হরে শব্দের মানে কি ?

— বুঝেছি, এই বয়সে কেষ্ট ঠাকুর তোমার মাথা ঘুরিয়েছে, কিন্তু আমার ঠাকুরের নাম তো শিব।

— ও ! তা ভাল, তোর শিবের মতো বর হোক ! রাখছি।

রাত সাড়ে নটা, মেজ ছেলের সঙ্গে কথা বলা যেতেই পারে, কিন্তু কিভাবে শুরু করবেন ? গতকালের অত কথা কাটাকাটির পর —

— বাবু, এবার মেজ জেঠু মৃন্ময়কে ধরে দাও — নাতিকে বললেন।

— কি বলছ ? — মেজ ছেলের শুকনো গলা।

— বয়স তো হচ্ছে, এত মাথা গরম করলে চলে বাবা ? একটা কথা বলত, তুই কি কলকাতায় এসে থাকবি, না তোর ছেলে এসে থাকবে ? সে বুঝে তো ব্যবস্থা।

— সে নাই বা থাকলুম।

— ঠিক আছে, এটা আমার জানা রইল। আমি যা করবার করব। এবার একটা অন্য কথা বলি, তোরও তো বয়স হচ্ছে, একটু ঈশ্বর চিন্তা কর ! মঠ মন্দিরে যাস ?

— এমনি যাওয়া হয়না, তবে দুগ্গাপুজো কালীপুজো এসবে যাইটাই। অবশ্য তোমার বৌমা মাঝে মাঝে শিবমন্দিরে যায়।

— এবার দুজনে দীক্ষা নিয়ে নে, বৌমা কি বলে ?

— ওসব নিয়ে ভাবিনি কখনো।

— ভাব একটু। আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, এইযে হরে কৃষ্ণ নাম এর হরে কথাটার অর্থ কি ?

— বোঝো! — মৃন্ময় হেসেই অস্থির — ভাল লোককে জিজ্ঞেস করেছ! দাঁড়াও, দেবযানীকে জিজ্ঞেস করি।

— বুম্বা টুম্পাকেও জিজ্ঞাসা কর, আমি ধরে আছি।

কিন্তু না, কেউ বলতে পারল না।

বাকি রইল মেয়ে জামাই নাতি। মেয়ের বাড়ি বনেদি বাড়ি, সুন্দর ঠাকুর দালান, দুর্গাপুজো, লক্ষ্মীপুজো, কালীপুজো সবই হয়, কিন্তু ওরা সব শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত, ওরা কেউ উমারানীকে সন্তুষ্ট করতে পারল না। এবার ছোট বৌমা, কিন্তু তিনি একেবারেই আধুনিকা! নেহাৎ দায় পড়ে লক্ষ্মীপুজোর জোগাড়টুকু করে, কিন্তু রোজ ঠাকুর ঘরে যাওয়া টাওয়া ওসবে নেই! যাই হোক, তবু একবার জিজ্ঞাসা করলেন, উত্তর হলো — ওসব জানবার বয়স এখনো আমার হয়নি মা, বয়স হলে মনের তাগিদে ঠিক জেনে নেব।

বাকি রইল ছোট নাতনি, সে আর এসবের কি জানবে। জিজ্ঞেস করতে ফিক করে হেসে চলে গেল।

ক্ষুব্ধ উমারানী মনে মনে ভাবলেন — দেখা যাক, সকলকেই তো বললাম, কেউ যদি মনের তাগিদে আর আমার ওপর ভালবাসায় শাস্ত্র ঘেঁটে আমাকে জানায়! হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু, তুমি সাক্ষী, তাকেই আমি সম্পত্তির অর্ধেক দিয়ে দেব।

কিন্তু সাতদিন অপেক্ষা করে যখন পুনরায় সবাইয়ের কাছে জানতে চাইলেন এটা কেউ খোঁজ করেছে কিনা, সবাই অবাক হয়ে গেল শুনে যে এ ব্যাপারটা নিয়ে তিনি এখনো ভাবিত! তারা তো এসব তখনই মুছে ফেলে দিয়েছে।

উমারানী আরো বেশি করে জপে মন দিলেন, নাতিকে ডেকে ফোনে আর সিনেমা বা গান লাগিয়ে দিতে বলেন না, কাউকে ফোনও করেন না। নাতিই ওটা চার্জ দেয় আর গেম খেলে।

সাত দিনের দিন সকালে জপের শেষে ছাদের পাঁচিলে হেলান দিয়ে আনমনে দাঁড়িয়ে যখন কিছুই ভাবছেন না, ছোট নাতি চিন্টুমশাই পাশে এসে দাঁড়াল, বলল — তোমার মনটা বড্ড খারাপ না ঠাকুমা?

— হ্যাঁ বাবুভাই।

— আমারও।

— কেন? তোমার কেন?

— বা রে, আমিই তো হ্যালো কৃষ্ণ বলে তোমার মনটা উলট পালটা করে দিয়েছি। জানো ঠাকুমা আমি কদিন ধরে মোবাইলে গুগল এ খুঁজে খুঁজে হরেকৃষ্ণ মানে খুঁজে পেয়েছি, এই দেখ, এটা পড়, হরে মানে রাধা!

মনন দাস

জন্ম ঃ ১৯৪২